পিরামিডাল কবিতার অনন্য স্রষ্টা ও টাঙ্গাইলের গৌরব মো. রিদওয়ানুর রহমান জনাব এস. এম. শামসুজ্জামান এবং জনাব সুফিয়া বেগমের একমাত্র পুত্র। তিনি ১৯৮৬ সালের ২৯ মে জন্মগ্রহণ করেন। উনি ঘাটাইল উপজেলার ঝুনকাইল গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২০০৪ সালে ঢাকার গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি, এবং ২০০৬ সালে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। তারপর ২০১১ সালে, তিনি স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ থেকে ইংরেজিতে অনার্স সম্পন্ন করেন। অনার্সে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই, তিনি পিরামিডাল কবিতার উপর প্রাথমিক প্রকল্প তৈরি করেন এবং এর ব্যাখ্যা হিসেবে একটি চমৎকার সাহিত্য তত্ত্ব ***The Sultanate of Pyramidal Poem*** লেখা আরম্ভ করেন। এই গবেষণামূলক কর্ম চলাকালীন সময়েই, ওনার সাতাশটি ইংরেজি পিরামিডাল কবিতা ***দি ইন্ডিপেনডেন্ট*** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১২ সালের ৫ এপ্রিল, পিরামিডাল কবিতার অদ্বিতীয় স্রষ্টা হিসেবে ***দি ইন্ডিপেনডেন্ট*** পত্রিকায়, ওনার একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল "Catching up with an Unconventional Poet"।

মো. রিদওয়ানুর রহমান একজন কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও, তিনি ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজি ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে, তিনি মাস্টার্স থিসিস সম্পন্ন করেন প্রাচীন মিশরীয় ভাষার উপর। সত্যি বলতে, তিনি বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম এই প্রাচীন ভাষাটির উপর সবিস্তারে গবেষণা করেন। ওনার সেই গবেষণামূলক কর্মের শিরোনাম ছিল ***Ancient Egyptian Hieroglyph as the Pictorial Scrutiny of Modern Linguistics***। উনি এই অসাধারণ গবেষণাটি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন ২০১৪ সালের ২ জুলাই। তাঁর এই মূল্যবান গবেষণামূলক কর্মটি, অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শিল্পতরু প্রকাশনী থেকে বই আকারে ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এর পূর্বেই ২০১৮ সালে, তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে তাঁর দ্বিতীয় মাস্টার্স সম্পূর্ণ করছিলেন, তখন ফেব্রুয়ারির অমর একুশে গ্রন্থমেলায়, ওনার লেখা দেশের প্রথম পিরামিডাল কবিতার বই ***দগ্ধ হৃদয়*** প্রকাশিত হয় 'শিল্পতরু প্রকাশনী' থেকে।

সংশয়ী প্রশ্নবাণ ও বুদ্ধিদীপ্ত ঈমান

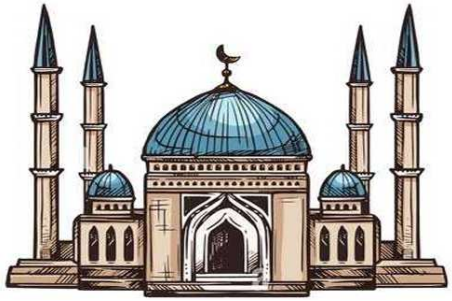

সাহিত্যদেশ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার-২০২১

(ধর্মচিন্তা ও জীবনধারা)

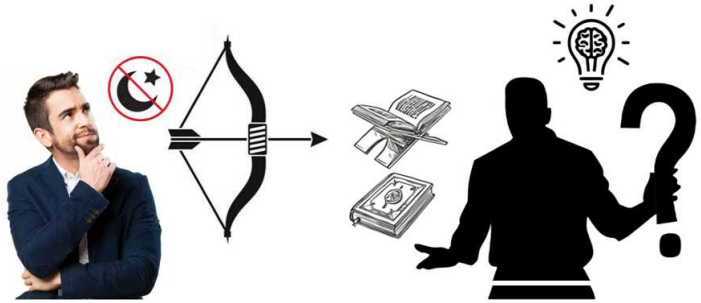

মো. রিদওয়ানুর রহমান

ILIM Press
Be a Light to Yourself

সংশয়ী প্রশ্নবাণ ও বুদ্ধিদীপ্ত ঈমান

মো. রিদওয়ানুর রহমান
(সাহিত্যদেশ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার-২০২১ মনোনীত লেখক)

প্রথম প্রকাশ ২০২৫

ILIM Press
House-12/1,
New Circular Road,
West Malibagh,
Dhaka-1217,
Bangladesh.

© Copyright-Free for Promotion Only

ISBN: 978-984-35-8443-4

Be a Light to Yourself

উৎসর্গ

কোরানের ঊনিশ তুমি, ওই কুমারী মাতার নাম,
হয়েছি যে ধন্য এ আমি, পেয়েগো তোমায় ওগো মারিয়াম!

কিছু কথা

'সংশয়বাদ' (Skepticism) শব্দটি অনেক বৃহৎ পরিসরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেকোনো কিছুকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মনোভাবকেই সংশয়বাদ বলা যেতে পারে। সাধারণ্যে বহুল প্রচলিত কোনো ধারণাকে সন্দেহ করা অর্থে সংশয়বাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো কিছুর নিদর্শন পেলে, সেটাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে না নিয়ে, বরং সেই নিদর্শনটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই হল সংশয়বাদ। যারা সংশয়বাদ চর্চা করেন, তাদেরকেই সংশয়বাদী বলা হয়। তাথাপি, আমার এই বইটিতে তথ্যবহুল প্রবন্ধগুচ্ছ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, আমাদের প্রিয় ইসলামকে লক্ষ্য করে ছোড়া সংশয়বাদীদের বিভিন্ন সংশয়ী প্রশ্নবাণগুলোকে, কুরআন-হাদীস এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করা।

এই বইয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে লেখা, তারপরও এই বইটি সাহিত্যদেশ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার-২০২১ হিসেবে মনোনীত হয়, এবং ১/২/২০২৫ তারিখে এর ISBN নাম্বার 978-984-99385-9-0 নির্ধারিত হয়। তারপর জানিনা কেনো 'সাহিত্যদেশ'-এর শ্রদ্ধেয় প্রকাশক জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম ওনার ওয়াদা ভঙ্গ করেন, এবং সম্মানিত লেখককে কয়েক বছর অযথা ঘোরানোর পর বইটি বইমেলায় প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করেন। অধিকন্তু, লেখককে ৫,০০০ টাকা মূল্যের প্রাইজবন্ড, সম্মাননা ক্রেস্ট, প্রশংসাপত্র, সনদপত্র এবং রয়ালটি থেকে বঞ্চিত করেন। ফলস্বরূপ, ILIM Press বইটি ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে ই-বুক হিসেবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

বইয়ের শুরুতেই, পবিত্র কুরআনের ছন্দগত ও অলংকারপূর্ণ নৈপুণ্য উপস্থাপিত হয়েছে বিবিধ কাব্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনাগুলো আসলেই প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসরণ করে কিনা, সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, পবিত্র কুরআন কেনো ইংরেজি ভাষায় নাজিল হয়নি, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইহার যৌক্তিক কৈফিয়ত প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বসমূহের সাথে, বর্তমানে প্রচলিত কয়েকটি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের নানাবিধ সাদৃশ্য ক্রমান্বয়ে দেখানো হয়েছে। মহান মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রহ:)-এর ব্যক্তিগত নানাবিধ দর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আরো বলতে গেলে, পবিত্র কুরআনের আলোকে অতীতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ডাইনোসরের ইঙ্গিত বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। তারপর, কুরআনের মাঝে লুকিয়ে থাকা বেশ কয়েকটি বিস্ময়কর গাণিতিক প্রক্রিয়া কার্যকরীভাবে পাঠকদের বোঝানো হয়েছে। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে মানুষের দ্বারা চন্দ্র বিজয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে আমাদের পবিত্র কুরআনে। হাদীস ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে, 'বোরাক' নামক জন্তুকে ঐশ্বিক মহাকাশযান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর, মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের গতিসূত্র ও ক্যালকুলাস সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব কর্ম নয়, এই কথাটির সত্যতা মধ্যযুগের কয়েকজন খ্যাতনামা আরবীয় গবেষকদের বিভিন্ন তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

আধুনিক মিশরীয় পণ্ডিত ড. ওসামা আলসাদায়ির বিবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে এসেছে, প্রাচীন পৌত্তলিক মিশরে প্রথাসিদ্ধ ইসলামিক চিন্তার অবিশাস্য নজিরসমূহ। এই বইয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, প্রাচীন মিশরীয় মমিদের অভিশাপ আসলে কালো জাদুর সাহয্যে, জিন বশীভূতকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর, প্রাচীন মিশরের মমিকরণ পদ্ধতি, এবং ফেরাউনের অভিশপ্ত লাশ নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে এই বইয়ে। উপরন্তু, কেনো সকল মিশরীয় শাসক 'ফেরাউন' হিসেবে স্বীকৃত নয়, কুরআন ও ইতিহাসের আলোকে এর সুস্পষ্ট জবাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও, মিশরের প্রসিদ্ধ মুসলিম পণ্ডিত কামালআদ্দিন আল-দামিরী বর্ণিত, কয়েকটি অদ্ভুত প্রাণীদের বাস্তব রূপে উপস্থাপন করার প্রামাণিক প্রয়াস চালানো হয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আধুনিক তরুণরা অনবরত বিভ্রান্ত হচ্ছে ভুল ও অসম্পূর্ণ ইসলামিক জ্ঞানের মাধ্যমে। কিছু আধুনিক শিক্ষিত তরুণরা বিবিধ ধর্মীয় জ্ঞান লাভের সময়, যখন বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে অনুধাবন করে, তখন তারা চরমভাবে বিরক্ত হয়ে পড়ে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তারা ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তাশীল হওয়া থেকে একেবারে বিরত থাকতেই পছন্দ করে। তাই এই বইটি লেখার উদ্দেশ্যই হল, বাংলাদেশী তরুণদের ধর্মীয় ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাশীল হতে উৎসাহ দেওয়া। যেন এর ফলে, বিজ্ঞ মুসলমান হিসেবে আমরা ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে, সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সারা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করে একটি অনবদ্য সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি।

সূচীপত্র

- পবিত্র কুরআন কি কোনো বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ? (**পৃষ্ঠা-০৭**)
- মুসলমানরা কি অতীতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ডাইনোসরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী? (**পৃষ্ঠা-১৯**)
- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় গৌরবময় ইসলামের সুস্পষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কেন নেই? (**পৃষ্ঠা-২৫**)
- পবিত্র কুরআন কি আমাদের আদৌ গণিত শিক্ষা দেয়? (**পৃষ্ঠা-৪৩**)
- পবিত্র কুরআনের কাহিনিগুলো কি সত্যিই প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসরণ করে? (**পৃষ্ঠা-৫১**)
- জিনের গাথা, তবে কি কল্পকথা? (**পৃষ্ঠা-৬৩**)
- পবিত্র কুরআনের লেখক ভবিষ্যতে মানুষের চাঁদে পদচিহ্ন রাখার ব্যাপারে আদৌ কি অবগত? (**পৃষ্ঠা-৭৫**)
- পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ফেরাউনের লাশ কি আদৌ মমি হিসেবে বিবেচনার যোগ্য? (**পৃষ্ঠা-৮৩**)
- পবিত্র কুরআন ইংরেজি ভাষায় নাজিল হলে কি ভালো হত না? (**পৃষ্ঠা-৮৯**)
- বোরাক কি আদৌ ঐশ্বরিক মহাকাশযান? (**পৃষ্ঠা-৯৭**)
- পবিত্র কুরআন প্রাচীন মিশরীয় সকল শাসককে কেন ফেরাউন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না? (**পৃষ্ঠা-১০১**)
- পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বসমূহের আলোকে কেমন হবে প্রচলিত ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর বিবিধ সৃষ্টিতত্ত্ব? (**পৃষ্ঠা-১০৭**)
- মহাবিজ্ঞানী নিউটন কাদের উত্তরসূরি? (**পৃষ্ঠা-১২৯**)
- কামালআদ্দিনের বর্ণিত আজব প্রাণীদের বাস্তব অস্তিত্ব থাকা আদৌ কি সম্ভব? (**পৃষ্ঠা-১৪৫**)
- গাজ্জালির দর্শন কী হেত্বাভাস নাকী সহিহ হাদিস? (**পৃষ্ঠা-১৫৭**)

পবিত্র কুরআন কি কোনো বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ?

কবিতায় অতিরঞ্জন আরবদেশের কাব্যশিল্পের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, পার্থিব কর্ম, বৃথা অহংকার, বীরত্ব, প্রেম ইত্যাদি ছিল আরবীয় কাব্য প্রেরণার প্রধান বিষয়বস্তু। কবিতা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, পবিত্র কুরআন চিরন্তন জীবনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও, পবিত্র কুরআনে অন্যান্য স্বাভাবিক কাব্যগুলোর মতোই ব্যবহৃত হয়েছে ছন্দগত ও অলংকারপূর্ণ নৈপুণ্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, পবিত্র কুরআন কোনো স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ কি না। কেননা প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক রচিত। আমি নিজে একজন সাহিত্যের ছাত্র। তাই স্বভাবতই আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং নানাবিধ সাহিত্য বিষয়ক অভিব্যক্তির আলোকে।

কাব্যধর্মী মাধুর্যে পরিপূর্ণ পবিত্র কুরআন

সবার প্রথমে 'অনুপ্রাস' (Alliteration) নিয়ে কথা বলা যাক। 'অনুপ্রাস' হচ্ছে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ বারবার উচ্চারিত হয়ে একধরনের ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি। অনুপ্রাস কাব্যের মধ্যে একটা ধ্বনিসাম্যের সৃষ্টি করে, যেটা স্বাভাবিকভাবেই কাব্যকে শ্রুতিমধুর

করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, জীবনানন্দ দাশের *'বনলতা সেন'* কবিতায়:

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।'

অপরদিকে পবিত্র কুরআনে সুরা আহযাবের ৭১ নম্বর আয়াতে 'অনুপ্রাস' পাওয়া যায়:

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

উচ্চারণ: 'ইউসলিহ *লাকুম আমা-লাকুম ওয়া ইয়াগফিরলাকুম যুনুবাকুম* ওয়া মাই ইউতিইল্লাহা ওয়া রাসুল্লাহু ফাকাদ ফাযা ফাওযান আজীমা।'

অর্থ: আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং ওনার রাসুলের আনুগত্য করে সে তো মহা সাফল্য লাভ করবে।

এরপর, 'সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার' (Analogy) হচ্ছে দুটি বিসদৃশ, বিজাতীয় এবং অসম বস্তুর মধ্যে দিয়ে যে সাদৃশ্যবোধক অলংকারের সৃষ্টি হয়। দুটি বস্তুর মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত যতই বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন, কবি ওনার কবি প্রতিভার ঝলকে তাদের মধ্যে মিলের সেতুবন্ধন নির্মাণ করে একটির সাথে আরেকটিকে এমন তুলনা করেন যে, বিজাতীয় বস্তু দুটি যেন একই সূত্রে গাঁথা। যেমন, রবার্ট ফ্রস্টের 'Nothing Gold Can Stay' সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারপূর্ণ কবিতায়:

Nature's first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf's a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.

অন্যদিকে, পবিত্র কুরআনে সুরা গাশিয়ার ১৫ ও ১৬ নম্বর আয়াতে 'সাদৃশ্যমূলক

অর্থালংকার' পরিলক্ষিত হয়:

'এবং সারি সারি সাজানো বালিশসমূহ।
আর সবদিকে বিছানো গালিচাসমূহ।'

তারপর 'বিরোধাভাস অলংকার' (Antithesis) হলো সাহিত্যের এমন একটি অবস্থা যেখানে দুটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী মনে হলেও তাৎপর্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। যেমন:

'ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আশা মোদের মাঝে সন্তরে
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।'
—গোলাম মোস্তফা

পক্ষান্তরে, পবিত্র কুরআনে সুরা ফাতিরের ৭ নম্বর আয়াতে 'বিরোধাভাস অলংকার' পাওয়া যায়:

'যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে পরিত্রাণ, এবং বিরাট প্রতিদান।'

অধিকন্তু, 'স্বরাণুপ্রাস' (Assonance) হচ্ছে একই চরণে কিংবা কবিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশে একরকম ধ্বনিবিশিষ্ট স্বরবর্ণের ব্যবহার দ্বারা শৈলীগত আবহ নির্মাণ প্রক্রিয়া। এটা চরণের শেষেও হতে পারে এবং মাঝখানেও হতে পারে। অনেক সময় 'অনুপ্রাস' (Alliteration)-এর সঙ্গে স্বরাণুপ্রাস একযোগে ব্যবহৃত হয়। যেমন, জন কিটসের 'Ode to Autumn' কবিতায়:

'Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river-sallows, borne aloft'

পক্ষান্তরে, পবিত্র কুরআনে সুরা গাশিয়ার ২৫ ও ২৬ নম্বর আয়াতে 'স্বরাণুপ্রাস' দেখা

যায়:

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم

উচ্চারণ:
ইন্না ইলাইনা ইয়া বাহুম
ছুম্মা ইন্না আলাইনা হিসা বাহুম

অর্থ: পরিশেষে আমারই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা আমারই কাজ।

তা ছাড়াও, সাহিত্যকর্মে 'বিপর্যাস' (Chiasmus) হল একধরনের লিখন পদ্ধতি যেখানে দুটি বা তারও বেশি যৌগিক বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সংবলিত বাক্যাংশ একে ওপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার সময় একধরনের ওলটপালট অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন, জন কিটসের 'Ode on a Grecian Urn' কবিতায়:

'Beauty is truth, truth beauty'

অন্যদিকে, পবিত্র কুরআনে সুরা আল-ইমরানের ২৭ নম্বর আয়াতে 'বিপর্যাস' দৃষ্টিগোচর হয়:

'তুমিই প্রবেশ করাও রাতকে দিনের ভেতরে, এবং দিনকে রাতের ভেতরে। তুমিই বের করে আনো জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে আবার মৃতকে বের কর জীবিতের ভেতর থেকে...'

আরো বলতে গেলে, সাহিত্যকর্মে 'অতুক্তি' (Hyperbole) এটাই ইঙ্গিত দেয়, কোনো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য, কিংবা হাস্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে অতিশয়োক্তি করা। কালজয়ী ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপিয়রের ***ওথেলো*** নাটকে, ইয়াগো নামক একটি চরিত্র হতভাগ্য বীর নায়ক ওথেলো সম্পর্কে গভীর আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে

অত্যুক্তি করে:

'Not poppy, nor mandragora, Nor all the drowsy syrups of the world Shall ever medicine thee to that sweet sleep Which thou ow'dst yesterday' (Act-3, Scene-3)

অপরদিকে, পবিত্র কুরআনে সুরা আরাফের ৪০ নম্বর আয়াতে 'অত্যুক্তি' স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়:

'যারা নিঃসন্দেহে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, এবং তার প্রতি অহংকার দেখায় তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না, এবং তারা কখনো বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না উট সুচের ছিদ্র দিয়ে অতিক্রম করে...'

সাহিত্যে অলংকারের ক্ষেত্রে, 'উপমা অলংকার' (Simile) কথাটি দ্বারা তুলনা বোঝানো হয়ে থাকে। যে অলংকারে একই বাক্য ভিন্ন স্বভাবধর্মের দুটি বস্তুর মধ্যে যেরূপ সাদৃশ্য বা তুলনা দেখানো হয়, তাকেই উপমা অলংকার বলা হয়। এই সাদৃশ্য গুণগতও হতে পারে আবার ক্রিয়াগতও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট শেখের 'দগ্ধ হৃদয়' নামক বাংলা পিরামিডাল কবিতায়:

'***ধূপের মতো নিঃশব্দে ছাই হয় পুড়ে*** আর ছড়ায় পুড়নটির বিষবাষ্প আমার হৃৎপিণ্ড'

অপরদিকে, পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারার ৭৪ নম্বর আয়াতে স্পষ্টভাবে 'উপমা অলংকার' পরিলক্ষিত হয়:

'এর পরও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, ***তা পাথরের মতো*** বা তার চেয়েও কঠিন...'

এ ছাড়াও 'পরোক্ষ উপমা' (Metaphor) হলো যে শব্দ প্রচলিত অর্থে কোনো বস্তু, গুণ বা কর্ম বোঝায় তাকে ভিন্ন বস্তু, গুণ বা কর্মের সাথে একীভূত করে ব্যবহার করা হয় সরাসরিভাবে এবং তুলনামূলক উক্তি ব্যতিরেকেই। যেমন, সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট

শেখের 'ভালবেসেছি তোমায়' নামক পিরামিডাল কবিতায়:

'কায়রাকানা তুমি! পাওনি দেখিতে মম সেই রং, পাওনি বুঝিতে মোর সেই মোকাম,
হেতু দিলটি তব পাথর'

অপরদিকে, পবিত্র কুরআনে সুরা ফুরকানের ২৩ নম্বর আয়াতে 'পরোক্ষ উপমা' হিসেবে দেখা যায়:

'আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করব এবং ***সেগুলোকে উৎক্ষিপ্ত ধুলারাশি বানিয়ে দেব***।'

পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারার ২৬ নম্বর আয়াতে, আল্লাহ্ তাআলা নিজের 'উপমা' ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন:

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না কোনো বস্তু দিয়ে উপমা দিতে, হোক তা মশা কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কিছু... কিন্তু যারা অবিশ্বসী তারা বলে, আল্লাহ্ কী উদ্দেশ্যে এ তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিয়েছেন? এ দিয়ে আল্লাহ্ অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তবে ভ্রষ্টাচারী ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এরূপ উপমা দিয়ে গোমরাহ করেন না।'

অধিকন্তু 'লক্ষণা অলংকার' (Metonymy) সাহিত্যের এমন একটি অলংকার, যেখানে কোনো শব্দের (নামের) স্থলে তার সাথে অর্থসংশ্লিষ্ট আরো একটি শব্দ (নাম) ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোনো কিছুর স্থলে তার গুণসম্পন্ন বা প্রতীকরূপ অন্য কিছুর উল্লেখ। যেমন: 'বাবা পরিবারের মাথা'। আমরা জানি মাথা হলো শরীরের প্রধান অঙ্গ। তাই এই বাক্যে বাবাকে পরিবারের মাথা বলে লক্ষণা অলংকার সৃষ্টির মাধ্যমে প্রধান বোঝানো হয়েছে।

অপরদিকে, পবিত্র কুরআনে সুরা কামারের ১৩ নম্বর আয়াতে 'লক্ষণা অলংকার' দেখা যায়:

'আমি তাকে (নবী নুহ) আরোহণ করালাম তাতে যা ছিল ***তক্তা ও পেরেক সংবলিত***।'

এই আয়াতটিতে নবী নুহ (আ.)-এর মহাপ্লাবন সম্পর্কে বলা হচ্ছে 'জাহাজ' বা 'নৌকা' শব্দটি আদৌ ব্যবহৃত হয়নি। সত্যি বলতে, এই আয়াতটিতে লক্ষণা অলংকার হিসেবে 'জাহাজ'-এর স্থলে 'তক্তা ও পেরেক সংবলিত' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সাহিত্যতত্ত্বে, 'প্রতীক' (Symbol) হচ্ছে, যখন একটি জিনিস দিয়ে ভিন্ন আরেকটি জিনিস বোঝানো হয়। কার্যত কোনো ব্যবহৃত শব্দ যখন তার সহজ সাধারণ আক্ষরিক অর্থকে অতিক্রম করে ভিন্নতর অর্থের ইঙ্গিত দেয়, তখনই সাহিত্যের পরিভাষায় সেটাকে বলা হয় 'প্রতীক'। ফলস্বরূপ, গোলাপ সৌন্দর্যের প্রতীক, পায়রা শান্তির প্রতীক, অন্ধকার মন্দের প্রতীক ইত্যাদি।

অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে সুরা আরাফের ৫৭ নম্বর আয়াতে আমরা 'প্রতীক'-এর প্রয়োগ দেখি: 'তিনিই ***বায়ুকে*** সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন বৃষ্টির পূর্বে...'। প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াতটিতে 'বায়ু' শব্দটি প্রতীক হিসেবে বিচারশক্তিসম্পন্ন প্রগতি ও প্রত্যাশার প্রতীয়মান হয়েছে।

বিবিধ সাহিত্যকর্মে, 'নরত্বারোপ' (Personification) হচ্ছে নিষ্প্রাণ জড়বস্তু বা বিষয় বা বিমূর্ত কোনো গুণ বা দোষ প্রভৃতির মানুষিক প্রাণ আরোপ করে তাকে সেভাবে অভিহিত করা। উদাহরণস্বরূপ:

'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রলসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দ্বীপ শিখা
দিনের কল্লোল 'পর টানি দিল ঝিল্লি স্বর
ঘন যবনিকা।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পক্ষান্তরে, পবিত্র কুরআনে সুরা আহযাবের ৭২ নম্বর আয়াতে 'নরত্বারোপ' স্পষ্টরূপে দেখা যায়: 'আমি তো আমানত পেশ করেছিলাম আসমান, জমিন এবং পর্বতমালার

সামনে, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তা গ্রহণ করতে ভয় পেল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল, নিশ্চয়ই সে অতিশয় অন্যায়কারী এবং অজ্ঞ।'

তারপর 'শ্লেষালংকার' (Pun) হচ্ছে ধ্বনির দিক থেকে একরকম কিন্তু অর্থের দিক থেকে আলাদা শব্দ নিয়ে খেলা করা। একটু ভিন্নভাবে বলতে গেলে, 'শ্লেষালংকার' হলো একাধিক অর্থে একই শব্দের অথবা একই উচ্চারণযুক্ত কিন্তু ভিন্ন অর্থসংবলিত শব্দের ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট অলংকার। গুরুগম্ভীর এবং কৌতুকপ্রদ উভয় ক্ষেত্রেই 'শ্লেষালংকার' ব্যবহার হতে পারে। যেমন, উইলিয়াম শেকসপিয়র ওনার ***রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট*** নাটকে রক্তক্ষরণে মৃত্যুপথযাত্রী মার্কুশিও বলেন, 'Ask for me tomorrow and you shall find me a ***grave man.***'। এখানে 'শ্লেষালংকার' হিসেবে 'grave man' (কবর মানব) দ্বারা 'dead man' (মৃত মানব) বোঝানো হচ্ছে। অপরদিকে, পবিত্র কুরআনে সুরা আনামের ২৬ নম্বর আয়াতে 'শ্লেষালংকার'-এর নিদর্শন পাওয়া যায়:

'আর তারা তা থেকে অপরকে নিবৃত্ত রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকে। তারা তো নিজেদেরই ধ্বংস করছে, অথচ তা বুঝতে পারছে না।'

এ ছাড়াও 'ব্যাজস্তুতি অলংকার' (Irony) হল নিন্দার মাধ্যমে স্তুতি এবং স্তুতির মাধ্যমে নিন্দ দ্বারা কাব্যিক কল্পনার চমৎকারিত্বে যে ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়। উদাহরণ নিচে উপস্থাপিত হলো:

'অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

'ব্যাজস্তুতি অলংকার' হিসেবে, ভারতচন্দ্রের লেখা উদ্ধৃতিটিতে নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা বা স্তুতির ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে সুরা দুখানের ৪৭ থেকে ৪৯ নম্বর আয়াতগুলোতে 'ব্যাজস্তুতি অলংকার'-এর প্রয়োগ দৃশ্যমান হয়:

'আদেশ হবে: একে ধর এবং হেঁচড়ে নিয়ে যাও দোজখের মাঝখানে, তারপর তার মাথার ওপর ঢেলে দাও আজাবের ফুটন্ত পানি, বলা হবে, আস্বাদন করো, তুমি তো ছিলে

মহাশক্তিশালী, পরম সম্মানিত।’

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াতগুলোতে প্রশংসা বা স্তুতির মাধ্যমে নিন্দার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

সাহিত্যজগতে, হাইকু (Haiku) হলো তিন পঙ্‌ক্তির ক্ষুদ্রাকার জাপানি কবিতা। জাপানের পুরনো এবং আধুনিক সব কবিতার মধ্যে ‘হাইকু’ সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই বিশেষ আঙ্গিকের কবিতায় একটিমাত্র ভাবনা, অনুভূতি বা চিত্রশিল্প তুলে ধরা হয়। জাপানি সংস্কৃতি সংস্কৃতি এবং তাদের দীর্ঘ জীবন দর্শনের সম্পূর্ণ রূপ এই ‘হাইকু’। যদিও, ইংরেজি হাইকুও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই, যার জীবন্ত প্রমাণ আমরা কবি জেমস কার্কাপের 'Evening' কবিতাটিতে পাই:

In the amber dusk
Each island dreams its own night.
The sea swarms with gold.

অন্যদিকে, পবিত্র কুরআনে সুরা কাউসারের পঙ্‌ক্তি বা আয়াত সংখ্যা হাইকুর মতোই তিনটি। কিন্তু অজ্ঞতাবশত, আমার পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই সুরা কাউসারকে একধরনের হাইকু হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সুরা কাউসার আদৌ হাইকু নয়। কেননা হাইকু কবিতায় শব্দমাত্রার (Syllable) সংখ্যা কিছুতেই ১৭টির বেশি হবে না। অপরদিকে সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, সুরা কাউসারে শব্দমাত্রার সংখ্যা ২৬টি।

সুরা কাউসার	সুরা কাউসারের শব্দমাত্রাসমূহ
إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴿١﴾	— — — — — — — ∧
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾	— — ∧ ∧ — ∧ ∧ — —
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾	— ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ — — ∧
টীকা: এখানে বাঁয়ে সুরা কাউসারের ও ডানে সুরা কাউসারের প্রদর্শিত ২৬টি শব্দমাত্রাসমূহে (—) লম্বা এবং (∧) খাটো শব্দমাত্রা নির্দেশ করছে।	

কবিতা লেখার ক্ষেত্রে, ‘অন্ত্যমিল’ (Rhyme) হচ্ছে সাধারণ কথায় একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোর চরণগুলোতে প্রায় একই ধরনের ধ্বনি সৃষ্টি। যেমন—মো. রিদওয়ানুর রহমানের ‘বিধুর সুরতরঙ্গ’ কবিতায়:

‘ফজরের বিজন ***সুরে***,
নিত্যপ্রলয় মম গেল যে **উড়ে**।
দেখি আবছায়া শেজে মেলে দু ***অক্ষি***,
ধবলিমায় জড়ানো এযে আমারই ***হৃদয়লক্ষ্মী***!’

পক্ষান্তরে, সুরা কাউসারে ‘অন্ত্যমিল’-এর সুস্পষ্ট প্রয়োগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়:

সুরা কাউসারের উচ্চারণ	সুরা কাউসারের অর্থ
ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্নাশানিয়াকা হুয়াল আবতার	নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রাচুর্যের ঝরনা দান করেছি। অতএব, আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে কুরবানি করুন এবং নমাজ আদায় করুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই নাম-চিহ্নবিহীন নির্বংশ।

বিভিন্ন তাফসির বা ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে সুরা কাউসার পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট সুরা, যার প্রথম দুটি আয়াত কাবা শরিফের দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়:

'ইন্না আতাইনা কাল কাউসার
ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার'

আয়াত দুটির সারমর্ম, ভাষাশৈলী, মানগত ভাব এবং ছন্দময়তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তৃতীয় পঙ্‌ক্তি রচে দেওয়ার জন্য সমকালীন সাহিত্যিক, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতি চুনোতি পেশ করা হল। এরপর সকলে সমস্ত আবেগ আর প্রজ্ঞা উজাড় করে প্রাণান্তকর চেষ্টায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু, তৃতীয় আয়াতটি রচনা করা সম্ভব হল না। অবশেষে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবীয় কবি লাবিদ বিন রাবী'আ আয়াত দুটির সাথে অন্ত্যমিল হিসেবে তৃতীয় পঙ্‌ক্তি যোগ করেন এবং ক্ষান্ত হতে বাধ্য হন:

ইন্না আতাইনা কাল কাউসার
ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার
লাইসা হাজা মিন কালামিল বাশার

মহাকবি লাবিদ কর্তৃক রচিত পঙ্‌ক্তিটির অর্থ: 'নিশ্চয়ই এটা মানব রচিত বাণী নয়'।

পবিত্র কুরআনে এত পরিমাণে কাব্যিক অলংকার রয়েছে, যার সবগুলো উপস্থাপন করা আমার জন্য একেবারেই অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানরা পবিত্র কুরআনকে একটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে, আমি শুধু পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেই আমার লেখা শেষ করব:

'নিশ্চয়ই এ কুরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক বাহিত বাণী, এবং তা কোনো কবির কথা নয়। তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো।' (সুরা হাক্কাহ, আয়াত-৪০ ও ৪১)।

'আমি রাসুলকে কবিতা শিক্ষা দিইনি, এবং তা ওনার জন্য শোভনীয়ও নয়। এটা তো

কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।' (সুরা ইয়াসিন, আয়াত-৬৯)।

'আর আমি তো এ কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। এ কুরআন আরবি ভাষায় এতে বিন্দুমাত্রও জটিলতা নেই যেন মানুষ সাবধান হয়।' (সুরা যুমার, আয়াত-২৭ ও ২৮)।

'এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দিই, কিন্তু তা কেবল জ্ঞানীরাই বোঝে।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত-৪৩)।

মুসলমানরা কি অতীতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ডাইনোসরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী?

ডাইনোসর (Dinosaur) শব্দটি ১৮৪১ সালে প্রথম ব্যবহার করেন স্যার রিচার্ড ওউয়েন। প্রকৃতপক্ষে, Dinosaur শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দদ্বয় Deinos এবং Sauros থেকে। Deinos অর্থ ভয়াবহ এবং Sauros অর্থ সরীসৃপ। এই প্রাণীটির সাথে আমরা সকল ধর্মের মানুষ কমবেশী সবাই পরিচিত। যে সময় ডাইনোসররা পৃথিবীতে বাস করত, বিজ্ঞানীরা সেই সময়ের নাম দিয়েছেন মেজোজয়িক যুগ। আজ থেকে প্রায় ২৪ কোটি বছর থেকে ছয় কোটি ৫০ লক্ষ আগের মধ্যের সময়টাই হলো মেজোজয়িক যুগ। এই মেজোজয়িক যুগকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন: ট্রায়েসিক, জুরাসিক এবং ক্রেটাসিয়াস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানদের নিকট এই প্রাণীটির অস্তিত্ব কি সত্যিই কাল্পনিক? এই প্রশ্নের উত্তর, পবিত্র কুরআন, হাদীস, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ্!

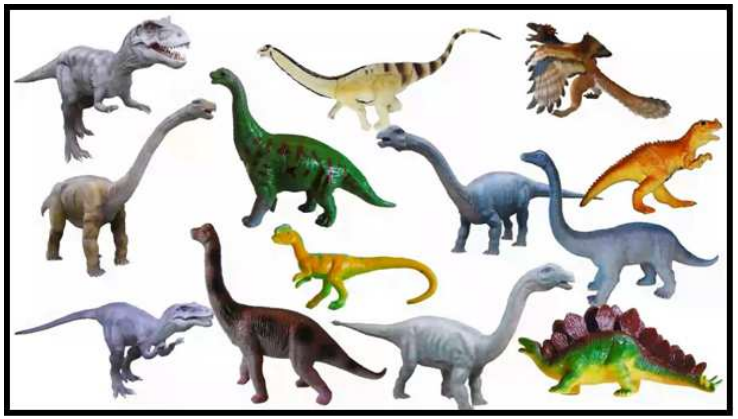

বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন প্রজাতির সুবিশাল ডাইনোসর

মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) কে মহান আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীর যে স্থানে নামিয়ে দেন, সেই স্থানটি ছিল বর্তমান শ্রীলঙ্কার একটি পাহাড়ের চূড়া। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের শ্রীপাডা নামক প্রদেশে এই চূড়াটি অবস্থিত। খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং মুসলিম এই চার ধর্মের অনুসারীদের কাছে অতি পবিত্র এই পাহাড়টির চূড়া। এই পাহাড়টি 'জাবাল-এ-আদম' নামে অধিক পরিচিত। এই চূড়াতেই মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) বেহেশত থেকে সরাসরি পতিত হয়েছিলেন। চূড়াটিতে আদম (আ.)-এর পায়ের যে চিহ্ন রয়েছে তার পরিমাপ হচ্ছে ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হচ্ছে ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। বৌদ্ধ ধর্ম মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে এই পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। অধিকন্তু, ২০১১ সালে মীনা বুক হাউস থেকে প্রকাশিত ***সহীহ্ বোখারী শরীফ***-এর ৩০৮৩ নম্বর হাদীসে আদম (আ.)-এর দৈহিক উচ্চতা সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ আছে:

'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ.) কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল **৬০** হাত . . .।'

পণ্ডিত মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়া মনে করেন, হযরত আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে আসেন, সেই সময় বেশ কিছু প্রজাতির সুবিশাল ডাইনোসরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাই ওনার শারীরিক উচ্চতা **৬০** হাত হওয়াটা মোটেও অস্বাভাকি নয়। কারণ ওনার উচ্চতা যদি বর্তমান সময়ের ৫ বা ৬ ফিট মানুষের সমান হত, তাহলে তিনি খুব সহজেই যেকোনো ডাইনোসরের খাবারে পরিণত হতেন। ওনার এই সুবিশাল উচ্চতার কারণেই তিনি ডাইনোসরদের খাবারে সেই ভাবেই পরিণত হননি, ঠিক যেই ভাবে রাস্তার কুকুরদের সামনে ৫ বা ৬ ফিট উচ্চতার মানুষ তাদের খাবারে পরিণত হয় না।

'জাবাল-এ-আদম'-এ হযরত আদম (আ.)-এর পায়ের ছাপ

বিজ্ঞান বলে, আজ থেকে প্রায় ২২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে থেকোডন্ট নামক ডাইনোসর বা সরীসৃপের আবির্ভূত হয়েছিল। প্রথম দিকে, ওরা অনেকটা কুমিরের মত

দেখতে ছিল এবং জলে বাস করত। ওদের পেছনের পা দুটো সামনের পায়ের তুলনায় অনেক বড় ও শক্তিশালী ছিল। প্রথমদিকে এই পেছনের পায়ে ভর দিয়ে থেকোডন্টরা জল থেকে ডাঙায় চলে আসে। থেকোডন্টরা খুব তাড়াতাড়ি ডাঙায় চলাফেরা করতে শিখল। ওদের মধ্যে অনেকেই পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লম্বা লেজে দেহের ভারসম্য রেখে হেঁটে বেড়াত। আবার কেউ কেউ চার পায়েই হাঁটতে লাগল। তারপর প্রায় আরো দুই কোটি বছর লাগল এই থেকোডন্টদের প্রথম ডাইনোসরে রূপান্তরিত হতে। প্রায় ১৪ কোটি বছর ধরে বিভিন্ন রকম ডাইনোসর এই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং পবিত্র কুরআনে সুরা লুকমানের ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ নিজেরই সৃষ্টির বর্ণনায় বলেছেন:

'তিনি (আল্লাহ্) আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং সেখানে (পৃথিবীতে) সব ধরনের জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন...।'

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াতে আল্লাহ্ ওনার সৃষ্টির সেই সময়ের বর্ণনা দিচ্ছেন, যে সময় পৃথিবীতে মানবজাতির আগমন ঘটেনি। অধিকন্তু আল্লাহ্ জীবজন্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জীবজন্তু কারা? কার্যত এই জীবজন্তুদের কিছু অংশই হলো বর্তমান সময়ের মানুষ প্রদত্ত নামধারী ডাইনোসর। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে সুরা জিনের ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন:

'আমরা (জিনরা) আসমানের সংবাদ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম তা কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ, আর পূর্বে আমরা সংবাদ শ্রবণ করার জন্য আসমানের বিভিন্ন ঘাটিতে গিয়ে বসে থাকতাম, কিন্তু এখন কেউ আসমানের সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার জন্য প্রস্তুত এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড পায়।'

অধিকন্তু, পবিত্র কুরআনে সুরা সাফ্ফাতের ৬ নম্বর থেকে ১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন:

'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর আকাশকে সুসজ্জিত করেছি নক্ষত্রমালার সুষমা দিয়ে, এবং

সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ফলে শয়তানের দল ঊর্ধ্বজগতের কোনো কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি সব দিক থেকে উল্কা নিক্ষেপ করা বিতাড়নের জন্য, এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি, কিন্তু কোনো শয়তান হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে, এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।'

উপরোক্ত আয়াতের সত্যতা বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। ওনারা বলেন যে, আমাদের পৃথিবীতে প্রতিবছরই উল্কাপাত হয়ে থাকে। সত্যি বলতে, প্রতিবছর ১৫০০ মেট্রিক টন উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তবে সেই উল্কাপিণ্ডগুলো বায়ুমণ্ডলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে ছোট ছোট টুকরার আকারে পতিত হয়, যাদের বেশির ভাগের রং থাকে কালো। যদি কখনো অনেক অনেক বড় উল্কাপিণ্ড সরাসরি পৃথিবীতে আসত, তাহলে পৃথিবীর প্রাণিকুল কোনোভাবেই বেঁচে থাকতে পারত না।

পণ্ডিত মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়ার মতে, সুরা জিনের ৮ ও ৯ এবং সুরা সাফ্ফাতের ৬ থেকে ১০ নম্বর আয়াতগুলোতে উল্লেখিত 'উল্কাপিণ্ড' শব্দটি পরোক্ষভাবে যে বিজ্ঞনসম্মত ইঙ্গিত দিচ্ছে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রায় ছয় কোটি ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে এই পৃথিবী থেকে ডাইনোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ধারণা করা যেতে পারে, কোনো একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড গতিশীলতার কারণে পৃথিবীর বেশ কাছে এসে পড়ে, এবং অভিকর্ষ বল সেটাকে ভীষণভাবে টেনে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে বাধ্য করে।

আধুনিক সময়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে মহাকাশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বস্তুখণ্ড, যা গ্রহাণুপুঞ্জ নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, ওই বস্তুখণ্ডগুলো বিস্ফোরিত ও লুপ্ত গ্রহ 'গ্রহ-এক্স'-এর ধ্বংসাবশেষ। যাই হোক, প্রাচীন মায়ান সভ্যতার মানুষেরা কোটি কোটি বছরের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। কার্যত, মায়ানদের একটি প্রাচীন লিখনফলক অনুযায়ী, 'গ্রহ-এক্স'-এর বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে মায়ানরা অবগত ছিল, তার প্রমাণিক তথ্য পাওয়া যায় তাদের চিত্রিত লিখনফলকের নিদর্শন অনুসারে।

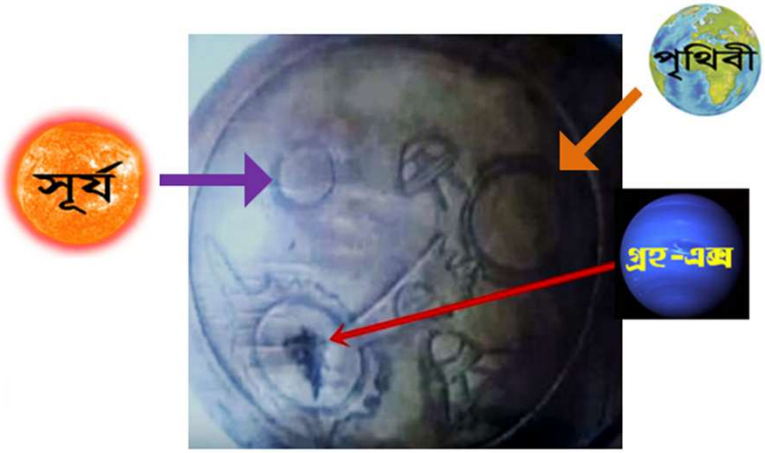

মায়ানদের প্রাচীন লিখনফলকে 'গ্রহ-এক্স'-এর অস্তিত্ব

এবার, আধুনিক বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আসা যাক। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে, একটা বিরাট আকারের উল্কাপিণ্ড এই পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে বিশাল আকারের ধুলো-মেঘের সৃষ্টি করে, এবং সেগুলো সারা পৃথিবীকে এমনভাবে ঢেকে ফেলে যে, সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রবেশ করতে কোনোভাবেই সক্ষম হয় না। এর ফলে, তাপমাত্রার পরিবর্তনে গাছপালা এবং প্রাণিকুল মারা যায়। অধিকন্তু, উল্কাপাতের করণে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। তাই বিজ্ঞাণীগণ মনে করেন, ওই বর্ধিত তাপমাত্রা ডাইনোসরদের অবলুপ্তির কারণ হতে পারে।

ডাইনোসরের হাড়পাঁজরার জীবাশ্ম	ডাইনোসরের পায়ের ছাপ

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানরা সেই সকল বিষয়েই বিশ্বাসী, যেগুলোর বৈজ্ঞানিক, এবং যৌক্তিক নিদর্শন বা প্রমাণ আছে। বর্তমান বিশ্বের বুকে, ডাইনোসরদের টিকে থাকা জীবাশ্ম ও পায়ের ছাপ তাদের অতীত অস্তিত্ব, এবং নিদর্শন আজও বহন করে যাচ্ছে। তাই বলা যেতেই পারে, আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত সকল মুসলমান অবিসংবাদিতরূপে অতীতের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ডাইনোসরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় গৌরবময় ইসলামের সুস্পষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কোনো নেই?

আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাপনের যে বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে, তা বিলীন হয়ে গেছে সেই সুদূর অতীতে। মানুষ অতীতের ধ্বংসাবশেষের পানে সবসময় তাকিয়ে থাকে বিস্ময়বিভোর চোখে, এবং সেগুলোকে প্রায়ই ব্যাখ্যা করতে চায় দেবতা বা দৈত্যদের কৃতকর্ম বলে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাজ হল সেসব নিদর্শন আবিষ্কার করা, এবং সেগুলো থেকে এমন সব তথ্য উন্মোচিত করা, যা কাঁপিয়ে দেবে আমাদের এই বিশ্বাসের মনোজগৎকে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে, মানুষের মাঝে প্রথমবারের মত দেখা গেল এই সকল প্রাচীন যুগের নিদর্শনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রবণতা। আদি প্রত্নতত্ত্ববিদ বা পুরাকীর্তি সংগ্রাহকদের জানা ছিল না তাদের পর্যবেক্ষণকৃত বেশির ভাগ ধ্বংসাবশেষের বয়স নির্ধারণের উপায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, এ সকল ধ্বংসাবশেষের কোনো লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তাই কখনো কখনো, প্রত্নতত্ত্ববিদদের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম ও পুরাণমালার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হয়।

প্রত্নতত্ত্বের মূল কাজ হল খননকার্য, যা প্রত্নতত্ত্ববিদের জন্য বয়ে আনে সেই সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমষ্টি, যেগুলো ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন তত্ত্বকে যাচাই ও শুদ্ধতর করার জন্য। যদিও, আমাদের অতীতকে পুনর্নির্মাণ করার জন্য খননকার্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং শ্রম ও সময়সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া। এ ছাড়া, প্রত্নতত্ত্ববিদদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল তাদের আবিষ্কারগুলোর বয়স নির্ধারণ। মাঝে মাঝে কোনো আবিষ্কারের বয়স অনুমান করা সম্ভব হয়, যদি সেটাকে পাওয়া যায় মুদ্রার মতো জ্ঞাত বয়সসম্পন্ন কোনো বস্তুর সাথে একই স্তরে। কিন্তু কিছু কিছু আদি সভ্যতা এ জাতীয় কোনো বস্তু উৎপাদন করেনি। এ কারণে দীর্ঘকাল ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর বয়স নির্ধারণ করা হয় কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে।

বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর বয়স নির্ধারণের বেশ কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। যেমন রেডিওকার্বন পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ প্রায় ৭০ হাজার বছরের পুরোনো বস্তুর বয়স নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ৫০ হাজার বছরের অধিক পুরোনো বস্তুর ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি হয়ে ওঠে

ত্রুটিপূর্ণ। কারণ পরীক্ষণীয় বস্তুটিতে তখন অবশিষ্ট থাকে অতি সামান্য পরিমাণ কার্বন ১৪। ইতিহাসের ধূলিমলিন পথে খুঁজে পাওয়া সুদূর অতীতের বস্তুগুলোর বয়স নির্ণয় করার জন্য আরো একটি পদ্ধতি রয়েছে, সেটা হলো পটাশিয়াম-আর্গন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ১০ মিলিয়ন বছরের পুরোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও চিহ্নিত করা যায়। তবে এটা প্রয়োগ করা যায় কেবল আগ্নেয় শিলার উপর। এ ছাড়াও, পৃথিবীর বেশির ভাগ অঞ্চলে মৃৎপাত্রের টুকরোগুলো হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। তাই ভূমির যেসব স্তরে মৃৎপাত্রের টুকরোগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর বয়স নির্ণয় করা হয় থার্মোলুমিনেসেন্স পদ্ধতির মাধ্যমে।

আমাদের জন্মের বহুকাল আগেই যারা প্রয়াত হয়েছেন, সেই সকল মানুষের চিন্তাভাবনাকে উপলব্ধি করতে প্রাচীন লিখনও আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে সাহায্য করতে পারে। কোনো অজানা লিখনের অর্থোদ্ধার করতে হলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, কিংবা অনুমান করতে হবে লেখক কীরূপ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এ ছাড়া, আমাদের ওই লিখনটির ভাষা সম্পর্কে সর্বোচ্চ পরিমাণ অধ্যয়ন করতে হবে। তবেই আমরা ওই ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি, শব্দ, বাক্যাংশ এবং অর্থের সাথে বিভিন্ন চিহ্ন ও প্রতীকের সম্পর্ক স্থাপন করে ভাষাটির ব্যাকরণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হব। এরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপিগুলোর (Hieroglyphic Language) মর্মোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল, যেগুলো ছিল মিশরীয় পুরোহিতদের চিত্রসদৃশ লিখন। প্রকৃতপক্ষে মিশরীয় পুরোহিতদের চিত্রলিপিগুলো একসময় প্রাচীন মিশরবাসীদের কাছে দৈবিক ভাষা হিসেবে মান্যতা লাভ করে আসছিল। কারণ ওনাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, আদিম সময়ে, প্রজ্ঞার দেবতা থত্ এবং দেবী আইসিস ওনাদের পুরোহিত সমাজে ব্যবহারের জন্য এই চিত্রাক্ষরগুলো শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি

প্রিয় পাঠক! আপনারা যারা প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়সমূহে বেশ আগ্রহ রাখেন, আপনাদের মধ্যেই হয়তো অনেকেই বর্তমান মিশরের প্রয়াত বিখ্যাত মিশরতত্ত্ববিদ ড. ওসামা আলসাদায়ির নাম শুনে থাকবেন। ড. আলসাদায়ি ছোটবেলা থেকেই প্রাচীন মিশরের চিত্রলিপির প্রতি ভিষণ আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে, তিনি প্রাচীন মিশরীয় চিত্রাক্ষরসমষ্টি, ইংরেজি, এবং আরবি এই তিন ভাষার সমন্বয়ে একটি অভিধান রচনা করেন, যেটার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ হাজারেরও অধিক। এ ছাড়া, ওনার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ওপর উনি ১৫টি বই প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলে ওনার সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা প্রচারিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ প্রাচীন মিশরীয় চিত্রাক্ষর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উচ্চারণসহ তাৎপর্য বোঝার পারদর্শিতার ক্ষেত্রে উনি অনন্যসাধারণ।

ড. ওসামা আলসাদায়ি

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ড. আলসাদায়ির প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলো অধিকাংশ মানুষের নিকট কোনো অজানা? কার্যত, আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার এক সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারি, উনি প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাসের গতানুগতিক বিকৃতিকে সংশোধনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যেগুলো আসলে ইসলামিক এবং খ্রিষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ওনার আবিষ্কারগুলো ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেনি, যার কারণ হিসেবে উনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন:

(১) ড. আলসাদায়ির প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের চূড়ান্ত ফলাফল বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবেত্তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অজস্র ভুল ও অনুপযুক্ত ফলাফল উদঘাটন করেছে।

(২) অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ অকপটে স্বীকার করেন, ড. আলসাদায়ির অনুসন্ধানের ফলাফল শক্তিশালী যুক্তি বহন করে। কিন্তু ওনারা সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেন না, কারণ ড. আলসাদায়ির এ সকল আবিষ্কার ওনাদের বহু বছরের নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য অবলুপ্ত করে দিতে পারে।

(৩) কিছু মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ওনাদের শিষ্যদের ড. আলসাদায়ির তত্ত্ব অনুসরণ করার উপদেশ দেন। তবে সেই অনুসরণের কাজ হতে হবে অত্যন্ত গোপনে। অন্যথায় সেই মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ওনাদের চাকুরি হারাতে পারেন।

(৪) বর্তমান মিশরের সামান্য কিছু সংখ্যক প্রথাসিদ্ধ মুসলমান ও খ্রিস্টান গোষ্ঠী এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে একসময় অন্ধ ও যুক্তিহীনভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। অধিকন্তু, তারা তাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের কারণে ড. আলসাদায়ির এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড ও আবিষ্কার ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল।

মূলত এ সকল কারণেই ড. আলসাদায়ির আবিষ্কারগুলো ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেনি। তবে ড. আলসাদায়ি নিজে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, এটা শুধুই সময়ের ব্যাপার যে, ওনার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলো অচিরেই স্বীকৃত সত্য হিসেবে একদিন

অবশ্যই উন্মোচিত হবে।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। নবী হজরত ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে আমরা প্রায় সবাই জানি। একদা, হজরত ইবরাহিম (আ.) মিশর অতিক্রম করে বাবল-এ (Babylon) যাওয়ার পথে, তদানীন্তন মিশরীয় শাসকের সৈন্যদের দ্বারা বন্দি হন। সেই সুবাদে, হজরত ইবরাহিম (আ.) বেশ কিছু সময় মিশরে অবস্থান করেন এবং মিশরবাসীরাও ইবরাহিম (আ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে প্রাচীন মিশরীয় পুরাণে 'পটাহ' নামক একজন দেবতা রয়েছেন, যাকে বিশ্বাস করা হয় প্রাচীনতম ঈশ্বর হিসেবে। আবার পটাহকে দেখা যায় প্রাচীন মিশরীয় শাসকদের পিতা হিসেবে। অপরদিকে আমরা জানি মুসলমান, ইহুদি এবং খ্রিস্টান জাতির পিতা হলেন হজরত ইবরাহিম (আ.)। অধিকন্তু দেবতা পটাহর সৃষ্টির দার্শনিক প্রকৃতি ছিল ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা উৎপন্ন করা। অন্যদিকে আমরা জানি একজন নবী হিসেবে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ইবরাহিম (আ.)-এর মাঝেও সর্বদা বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন মিশরীয় দেবতা 'পটাহ'

ধরা যাক বাংলা ভাষায় 'দুর্নীতি দমন কমিশন', যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'দুদক'। এই 'দুদক' শব্দটি তিনটি শব্দের আদ্যক্ষর দিয়ে গঠিত একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ। বিপরীত পক্ষে, ড. আলসাদায়ির গবেষণা অনুসারে, 'পটাহ' আসলে কোনো নাম নয়, বরং এটা একটি

সম্পূর্ণ বাক্যের (শব্দসমূহের নয়) সংক্ষিপ্ত রূপ। কার্যত ড. আলসাদায়ির তত্ত্ব অনুসারে ধারণা করা হয়, প্রাচীন মিশরীয়রা হয়ত 'পটাহ' নামটিকে তাদের নিজস্ব চিত্রলিপি অনুসরণ করে 'ফতাহ' হিসেবে উচ্চারণ করত। এখন এই 'ফতাহ' শব্দটিকে যদি ভাঙা হয় তাহলে এটা দাঁড়ায় 'ফ + ত + আ + হ', এবং যেটাকে ক্রমান্বয়ে সাজালে দাঁড়ায়:

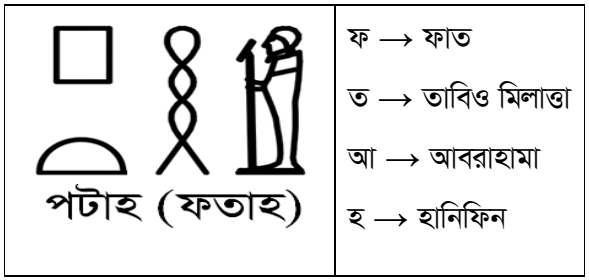

সুতরাং, প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স বা চিত্রলিপি অনুসারে, 'ফ + ত + আ + হ' পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করে 'ফাত তাবিও মিলাত্তা আবরাহামা হানিফিন', যার বাংলা অর্থ 'আব্রাহামের (নবী ইবরাহিমের) প্রশান্ত ধর্মমত অনুসরণ করুন'। এ ছাড়াও, পবিত্র কুরআনে সুরা হাজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, '...তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মের প্রতি সর্বদা সুদৃঢ় থেকো...'। তাই এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, প্রাচীন মিশরীয় দেবতা 'পটাহ' প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে নবী ও রাসুল হিসেবে খ্যাত ইবরাহিম (আ.) হলেও হতে পারেন।

নবী হজরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কেও আমরা মুসলমানরা প্রায় সবাই জানি, যিনি জন্মসূত্রে ছিলেন কানানের অধিবাসী। একদা, ঘটনাক্রমে কিছু বণিক ওনাকে মিশরে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এর পর থেকে, নবী ইউসুফ (আ.) মিশরেই বসবাস করেন। পবিত্র তৌরাত শরিফের দু-একটি আয়াতের মাধ্যমে ওনার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য জানা যায়। যেমন, পবিত্র তৌরাত শরিফে উল্লেখ আছে:

'...একশত দশ বৎসর বয়সে ইউসুফ ইন্তেকাল করলেন। তখন ওনার মৃতদেহটি খোশবু মশলা দিয়ে মমি করে একটি শবাধারে ঢুকিয়ে মিশরেই রেখে দেওয়া হল।' (পয়দায়েশ ৫০:২৬)।

প্রাচীন মিশরীয় মমির শবাধার

পবিত্র তৌরাত শরিফ থেকে আরো জানা যায়: '...মুসা ইউসুফের হাড়গুলো সাথে নিলেন, কারণ এই ব্যাপারে ইউসুফ বনি-ইসরাইলদের কসম খাইয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদের হেফাজত করবেন। এই জায়গা হতে যাওয়ার সময় তোমরা আমার হাড়গুলো তুলে সঙ্গে নিয়ে যেও।' (হিজরত ১৩:১৯)।

পবিত্র তৌরাত শরিফের উপরোক্ত আয়াত দুটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমি বলতে চাচ্ছি যে, প্রাচীন মিশরের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ভূগর্ভস্থ-সমাধিকক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমাধিকক্ষটি বর্তমান মিশরের তেল-এ-দাবায় অবস্থিত। অতীতে, তেল-এ-দাবা স্থানটি আসলে অ্যাভেরিস নামে পরিচিত ছিল। ধারণা করা হয়, নবী ইউসুফ (আ.)-কে এই সমাধিকক্ষে সমাধিস্থ করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ওনার অবশিষ্টাংশ সেখান থেকে সরিয়ে মিশরের বাইরে দক্ষিণ জেরুসালেমের হেবরন নামক স্থানে কবরস্থ করা হয়।

তেল-এ-দাবায় অবস্থিত নবী ইউসুফের আগের সম্ভাব্য সমাধিকক্ষ

প্রাচীন মিশরীয় পুরাণে, আমরা হোরাস নামক একজন দেবতাকে পাই যার মুখমণ্ডল বাজপাখির ন্যায়। কিন্তু শিশু বয়সে হোরাসের মুখমণ্ডল ছিল স্বাভাবিক মানুষের মত, এবং তখন তার নাম ছিল হারপোকরেতিস। দেবী আইসিস ছিলেন দেবতা হোরাস বা হারপোকরেতিসের মা। ফলে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনস্বরূপ, কিছু মূর্তি পাওয়া যায়, যেখানে মা দেবী আইসিস ওনার কোলের সন্তান হারপোকরেতিসকে স্তন্যপান করাচ্ছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা মুসলমানরা প্রায় সবাই জানি, নবী মুসা (আ.) জন্মসূত্রে ছিলেন মিশরের অধিবাসী। ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিসের ভয়ে মুসা (আ.)-এর মা (ওনার সম্ভাব্য নামসমূহ হলো ইউকাবিদ/বারেখা/ইউহানিয/লাহ-ইয়ানা) ওনাকে একটি ঝুড়িতে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। পরে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া শিশু মুসা (আ.)-কে নীল নদ থেকে উদ্ধার করে দ্বিতীয় রামেসিসের প্রাসাদে নিয়ে আসেন। তখন মহান আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে শিশু মুসা (আ.)-এর আপন মা ওনাকে স্তন্যপান করানোর দায়িত্ব নেন।

টীকা: চিত্রটির বামে বাজপাখির মুখের ন্যায় দেবতা হোরাস এবং চিত্রটির ডানে দেবী আইসিস ওনার সন্তান শিশু হোরাস বা হারপোকরেতিসকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। কিন্তু ড. আলসাদায়ির তত্ত্ব অনুসারে, এই চিত্রটির মাঝে মানবমুখো শিশু হোরাস বা হারপোকরেতিস আসলে নবী মুসা (আ.), এবং তথাকথিত দেবী আইসিস নামে খ্যাত প্রকৃতপক্ষে ওনার আপন মা।

প্রাচীন মিশরের শাসকরা সচরাচর বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিল, এবং এই ধর্মের মাধ্যমে নিজেদের দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে, এমন একজন শাসকের উল্লেখ আছে, যিনি ছিলেন মুসলিমদের মতোই শুধু একজন দেবতায় বিশ্বাসী। সেই মিশরীয় শাসক ছিলেন চতুর্থ আমেনহোতেপ। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫১ অব্দে, তিনি সিংহাসনে বসেন এবং পূর্বের নাম বদলে 'আখ-এন-এতন' নাম ধারণ করেন, যার অর্থ 'এতনের বান্দা'। বস্তুত চতুর্থ আমেনহোতেপের মতে, 'এতন' হলেন স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। পরবর্তী সময়ে, বহু ঈশ্বরবাদী পুরোহিতরা এ বিষয়টি মেনে নেয়নি এবং কিছু সৈন্যও সেই সকল পুরোহিতের সমর্থন করে। অবশেষে, ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা বিষ প্রয়োগে চতুর্থ আমেনহোতেপের মৃত্যু হয়। চতুর্থ আমেনহোতেপের মৃত্যুর পর, ওনার ছেলে তুতেনখামুন খ্রিস্টপূর্ব ১৩৩২ অব্দে সিংহাসনে বসেন এবং পুরোনো সেই বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম পুনরায় ফিরিয়ে আনেন।

চতুর্থ আমেনহোতেপ বা 'আখ-এন-এতন'

গভীর গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত থাকার ফলে, প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের পৌত্তলিক বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে চাইত না। একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার বার্তা নিয়ে কিছু লোক তাদের নিকট এসেছিল, কিন্তু পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদা তাদের বিকৃত বিশ্বাসের দিকে ফিরে যেত। অবশেষে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক হজরত মুসা (আ.) তাদের নিকট একজন নবী ও রাসুল হিসেবে প্রেরিত হন। মিশরের থিবসে লুক্সর মন্দিরে একটি সুন্দর ভাস্কর্য রয়েছে। এই ভাস্কর্যটি দীর্ঘদিন ধরে ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিসের বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল। কিন্তু ড. আলসাদায়ি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, এই ভাস্কর্যটি কোনোভাবেই দ্বিতীয় রামেসিসের হতে পারে না। কারণ এই ভাস্কর্যটির বাম কাঁধে, প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স হিসেবে খোদাইকৃত চিত্রাক্ষরগুলোতে, 'রা' ধ্বনি আদৌ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, বরং সেখানে 'মস-স-স' ধ্বনিটিই সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কার্যত, 'মস-স-স' ধ্বনি নির্দেশ করে 'মসেস' বা 'মযেস'। আমরা প্রায় সকলেই জানি পবিত্র তৌরাত শরিফে রচিত এই 'মসেস' বা 'মযেস' নামটিই ইসলাম ধর্মে মুসা (আ.) হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়াও এই ভাস্কর্যটির বাম কাঁধে হায়ারোগ্লিফিক্স দ্বারা আরো খোদিত রয়েছে জোড়া মুকুট। এই জেড়া মুকুট ধ্বনিরূপে প্রকাশ করে 'নব' (ন + ব), যা আসলে 'নবী' বোঝায়। সব শেষে, হায়ারোগ্লিফিক্সে লেখা পাখির পালকগুলো সততার প্রতিনিধিত্ব করে, যা সকল নবী-রাসুলের স্বাভাবিক গুণ।

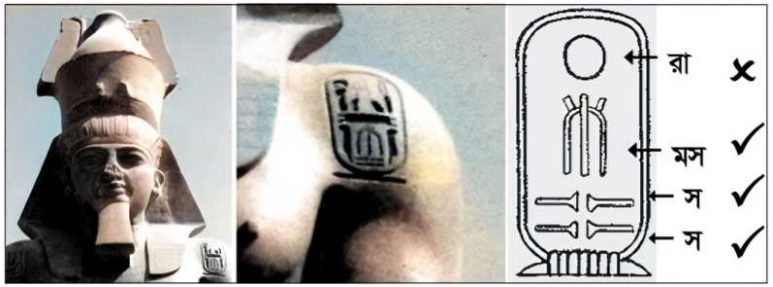

ড. আলসাদায়ির তত্ত্ব অনুসারে মোযেসের ভাস্কর্য

প্রাচীন মিশরে পঞ্চম রাজবংশের সময় থেকে, অর্থাৎ হেলিওপোলিস নামক নগরটির উত্থানের পর থেকে প্রাচীন মিশরীয় শাসকরা তাদের ঈশ্বরদের পুত্রে পরিণত হয়। যদিও, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কারণে তারা তাদের প্রথাগত অবস্থান বজায় রাখতে বাধ্য হয়। তীর্থস্থানগুলো পরিদর্শনকালে তারা একমাত্র সূর্য দেবতা 'রা' ছাড়া

সমস্ত ঈশ্বরকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করত। মিশরীয় শাসকরা ছিল তাদের ঈশ্বরদের জীবন্ত প্রতিনিধি এবং একই সাথে ছিল তাদের যাজকগোষ্ঠী। এর ফলে, কখনো কখনো তারা চিত্রিত হতো এ রকমভাবে যে, নিজেরাই নিজেদের পূজা করছে, অথবা একই পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করছে ঈশ্বরদের। তাই সাধারণভাবে মিশরীয় শাসকদের বলা হতো সমস্ত কিছুর দেবতা এবং সূর্য দেবতা 'রা'-এর চোখ।

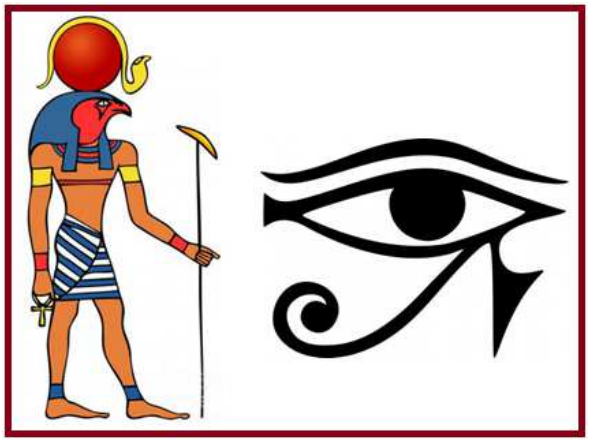

বামে সূর্য দেবতা 'রা' এবং ডানে তার বিখ্যাত অযুগ্ন চোখ

প্রাচীন মিশরের ঊনবিংশ রাজবংশের শাসনামলে, নবী হজরত মুসা (আ.) ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিসকে দ্বিনের দাওয়াত দিতে গেলে, দ্বিতীয় রামেসিস মুসা (আ.)-কে তীব্রভাবে উপহাস করেন, যেটা পবিত্র কুরআনে সুরা কাসাসের ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন:

'ফেরাউন বলল: ওহে সর্দারগণ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে আমি মনে করি না। হে হামান! তুমি কাদা পুড়িয়ে ইট বানাও এবং আমার জন্য সুউচ্চ মিনার তৈরি করো, যাতে আমি সেখানে উঠে উঁকি মেরে দেখতে পারি মুসার প্রভুকে। তবে আমার ধারণা, সে (নবী মুসা) একজন মিথ্যাবাদী।'

টীকা: বাঁ থেকে মিশরের চতুর্থ রাজবংশের শাসক খুফু (শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮৯-২৫৬৬ অব্দ), খুফুর গ্রেট পিরামিড এবং হিমন। প্রকৃতপক্ষে হিমন হলো খুফুর গ্রেট পিরামিডের প্রধান স্থাপত্যশিল্পী ও নির্মাতা। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনে ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিস (শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ১২৭৯-১২১৩ অব্দ)-এর নির্মাণকাজের প্রধান নির্মাতাকে হামান বলে সম্বধোন করা হয়েছে।

সুরা কাসাসের ৩৮ নম্বর আয়াতে ২ নম্বরে আন্ডারলাইন করা হয়েছে 'কাদা পুড়িয়ে ইট বানাও এবং আমার জন্য সুউচ্চ মিনার তৈরি করো'—এই বাক্যাংশে পরোক্ষভাবে পিরামিড তৈরির কথা বলা হচ্ছে, যদিও আমরা প্রায় সবাই জানি পিরামিড পাথরের তৈরি। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়োন পরীক্ষা করে দেখেছেন, মিশরের গিজার পিরামিডগুলোতে যে পরিমাণ পাথর আছে তা দিয়ে গোটা ফ্রান্সের চারদিকে ১০ ফুট উঁচু এবং এক ফুট ঘন দেয়াল তোলা সম্ভব। গিজার সবচেয়ে বড় হলো খুফুর গ্রেট পিরামিড, যেটাতে ২৩ লক্ষ বা মতান্তরে ২৫ লক্ষ পাথরের ব্লক রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কার করেছেন যে, পিরামিডের শীর্ষের অংশটুকু পাথরের নয় বরং সেই সময়ের ইট ও সিমেন্টের মিশ্রণে তৈরি।

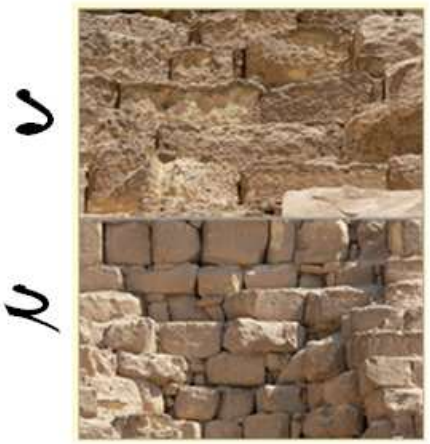

চিত্রটিতে '১' নির্দেশ করছে পিরামিডের ওপরের অংশে ইট ও সিমেন্টের মিশ্রণ, এবং '২' নির্দেশ করছে পিরামিড স্থাপনের মূল পাথরের ব্লক

এবার মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। সুরা কাসাসের ৩৮ নম্বর আয়াতে ৩ নম্বরে আন্ডারলাইন করা হয়েছে 'সেখানে উঠে উঁকি মেরে দেখতে পারি'। এই বাক্যাংশটি সেই স্থানে ওঠার নির্দেশ দিচ্ছে, যেটা পিরামিডের শীর্ষাস্থিত স্থানের ঢাকনা পাথর এবং যেখানে সূর্য দেবতা 'রা'-এর চোখ অবস্থিত বলে বিশ্বাস করা হয়। হতে পারে, দ্বিতীয় রামেসিস 'রা'-এর চোখের সাহায্যে দেখবেন, অথবা 'রা'-এর স্থলে বসে নিজেকে দেবতা মনে করার দরুণ নিজের চোখ দিয়ে উঁকি মেরে দেখবেন। খুফুর গ্রেট পিরামিডটির নির্মাণকাজ খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬০ থেকে ২৫৪০ অব্দ-এর মধ্যে সম্পন্ন হয়। সেই প্রাচীন সময়ে গ্রেট পিরামিডের উচ্চতা ছিল প্রায় ৪৮১ ফুট কিন্তু বর্তমানে এর উচ্চতা ৪৫৬ ফুট, কারণ এই পিরামিডটির শীর্ষাস্থিত স্থানের ঢাকনা পাথর চুরি করা হয়েছে কিংবা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

চিত্রটিতে '১' ও '২' নির্দেশ করছে গ্রেট পিরামিডের শীর্ষাস্থিত স্থান, যেখানে এক সময় ঢাকনা পাথর ছিল এবং '৩' নির্দেশ করছে গ্রেট পিরামিডের অতীত ও বর্তমান উচ্চতা

প্রকৃতপক্ষে, গ্রেট পিরামিডটির শীর্ষাস্থিত স্থানের ঢাকনা পাথর চুরি করা, কিংবা সরিয়ে ফেলার দুটি কারণ অনুমাণ করা যেতে পারে: প্রথমত হতে পারে ঢাকনা পাথরটিতে সূর্য দেবতা রা-এর চোখ খোদাই করা ছিল, এবং দ্বিতীয় করণ হতে পারে ঢাকনা পাথরটি ছিল সোনার তৈরি। তবে এর কারণ যাই হোক, এই ব্যাপারে পবিত্র ইঞ্জিল শরিফে উল্লেখ আছে:

'তখন ঈসা তাদের বললেন, আপনারা কি পাক-কিতাবের মধ্যে কখনো পড়েননি? রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরখানা বাতিল করে দিয়েছিল, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাথর হিসেবে বিবেচিত ছিল। প্রভুই এটা করেছিলেন, আর তা আমাদের চোখে খুব আশ্চর্য লাগে।' (মথি ২১:৪২)।

পিরামিডের শীর্ষাস্থিত ঢাকনা পাথরের একটি নমুনা

আমরা সর্বদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ডলারে স্মারক হিসেবে একটি সুস্পষ্ট পিরামিড

দেখতে পাই। অধকিন্তু, এই পিরামিডটির ঢাকনা পাথর সেই পিরামিড থেকে বিচ্ছিন্ন, কেননা সেটাতে একটি চোখ রয়েছে। এই চোখটিকে বর্তমান প্রচারমাধ্যম জগতে রূপকাশ্রিতভাবে সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের চোখ, লুসিফারের চোখ, দজ্জালের চোখ ইত্যাদি হিসেবে বিশ্বাস ও প্রচার করা হয়। আবার এটাকে আধুনিক বিশ্বে গুপ্তগোষ্ঠী ইলুমিনাতির বিশেষ প্রতীক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। তবে সত্যি বলতে, প্রাচীন মিশরে এই চোখটির আসল উৎপত্তি হয়েছিল সূর্য দেবতা 'রা'-এর চোখ হিসেবে।

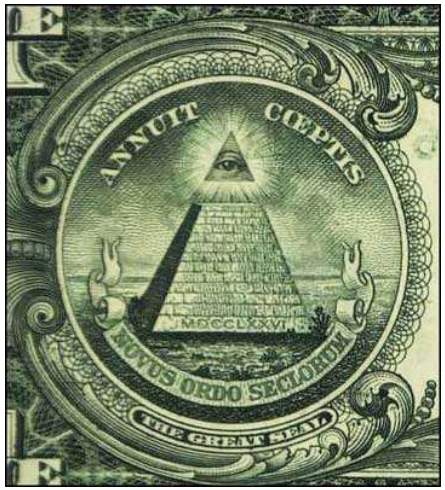

মার্কিন এক ডলারে আঁকা পিরামিড ও 'রা'-এর চোখ

মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে আরবদেশ সাহিত্যচর্চায় ছিল চূড়ান্ত শিখরে। ভাষা ও পাণ্ডিত্যে তারা ছিল সর্বসম্মতভাবে অতুলনীয়। তাদের রচিত যে সকল গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়, তা তাদের ভাষা ও পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করে। তারপর একসময়, মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে পবিত্র কুরআন প্রদান করলেন। কার্যত, আরবে পবিত্র কুরআনের ভাষা ও পাণ্ডিত্যের সামনে অন্যান্য সাহিত্যের ভাষা ও পাণ্ডিত্য দৃশ্যমান হয়েছিল সূর্যের আলোর সামনে মোমবাতির আলোর ন্যায়। পক্ষান্তরে, মহানবী (সা.)-এর আগমনের হাজার বছরের অধিক পূর্বে মিশরে নবী মুসা (আ.)-এর আগমন ঘটেছিল। নবী মুসা (আ.)-এর সময়ে মিশর জাদুবিদ্যায় উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সেই সময় জাদু ছিল একটি অলৌকিক বিষয়।

আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.)-কে এমন এক মোজেযা দান করেছিলেন, ওনার হাতের লাঠি অজগর সাপে পরিণত হয়ে যেত। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সুরা আরাফের ১০৬ থেকে ১০৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন:

'ফেরাউন বলল: যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনেই থাকো তবে তা উপস্থাপন করো, যদি তুমি সত্যবাদী হও। তখন মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, এবং তৎক্ষণাৎ তা একটি জলজ্যান্ত অজগর হয়ে গেল... ফেরাউন সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল: নিশ্চয়ই সে (নবী মুসা) একজন দক্ষ জাদুকর।'

টীকা: প্রাচীন মিশরীয় এই চিত্রটিতে অ্যাপোফিস বা এপেপ নামক একটি পৌরাণিক সাপ লাঠি হাতে দেবতা 'আটুম-রা'-এর সামনে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু ড. আলসাদায়ির মতে, এই চিত্রটিতে লাঠি হাতে নবী হজরত মুসা (আ.) এবং ওনার সামনে সেই প্রকাণ্ড অজগর সাপ।

আমরা সকলেই জানি, নামাজ আদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা সেভাবে নামাজ আদায় করো, যেভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখেছো।' কার্যত, মহানবী (সা.)-কে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) নামাজ আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। নামাজ আদায়ের সুশৃঙ্খল পদ্ধতিকে তারতীব বলে। বস্তুত, এই তারতীব রক্ষা করে নামাজ আদায় করা হলো ওয়াজিব। মহানবী (সা.)-এর আগমনের বহু বছর পূর্বে, প্রাচীন মিশরে এক-ঈশ্বরবাদীগণণ যেভাবে ইবাদত করতেন, সেগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের নামাজ আদায়ের সাথে মিলে যায়, যেগুলোর উজ্জ্বল নিদর্শন ড. আলসাদায়ি প্রাচীন মিশরীয় বিভিন্ন ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মের মাঝে আবিষ্কার করেছেন:

প্রাচীন মিশরে এক-ঈশ্বরবাদীদের সম্ভাব্য ইবাদতের পদ্ধতি

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে, শুধু ইসলামেরই নয়, বরং বিশ্বের সকল প্রত্নতত্ত্বই হচ্ছে অতীতের কোনো না কোনো স্মৃতির সাক্ষ্যকে পুনর্নির্মাণ করার এক নিরন্তর প্রয়াস। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন অজানা বস্তুসামগ্রী উদ্ধার করে সেগুলো সম্পর্কে নানাবিধ মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হন, এবং সেগুলোকে জীবন্ত করে তোলার জন্য ব্যবহার করেন ওনাদের দক্ষতা ও কল্পনা। ওনাদের এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপন করে হারিয়ে যাওয়া সেই অতীতকে, যার মধ্যে ইসলামিক নিদর্শন লুকিয়ে থাকাটা আদপেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। বস্তুত ইসলামের বিভিন্ন ইতিহাস ও পুরাকাহিনি প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিভিন্নভাবে নির্দেশনা দিয়ে থাকে অনুসন্ধানের সঠিক ও প্রকৃত পথ, যা পূর্বে হয়ত অনেকেই একদমই অনুধাবন করেননি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শুধু এতটুকুই বলব, প্রচীন মিশরীয় সভ্যতায়ও ইসলামের সুস্পষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অবশ্যই বিদ্যমান, কিন্তু সেগুলোর ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয় না তার মূল কারণ হচ্ছে, আধুনিক প্রচারমাধ্যমের সৎসাহসের অভাব এবং কিছু অজ্ঞ লোকজন, যারা ইসলাম ধর্মকে বিশ্লেষণ করে অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীনভাবে।

পবিত্র কুরআন কি আমাদের আদৌ গণিত শিক্ষা দেয়?

মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে গণিতবিদ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণিতের নতুন নতুন আবিষ্কার ও অগ্রগতি যেভাবে এগিয়ে গেছে, তেমনই গণিতবিদ্যার এই অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মানবসভ্যতারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আজকের এই মানবসভ্যতার যে উৎকর্ষ সাধন হয়েছে, তার মূলেও রয়েছে এই গণিতবিদ্যা। সকল যুগে, সকল দেশে, গণিতবিদ্যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অন্যতম পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেই দিক থেকে, পবিত্র কুরআনও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। পবিত্র কুরআন মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের একটি গ্রন্থ হলেও, তা অনেক গাণিতিক নিদর্শন বহন করে থাকে।

খলীফা ওসমান (রা.)-এর সময়ে হরিণের চামড়ায় লেখা গণিতময় পবিত্র কুরআন

আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সুরার শব্দের মাঝে বিভিন্ন হরফের সংখ্যা '১৯'-এর গুণিতক। অর্থাৎ, মোট শব্দসমষ্টিকে ১৯ দিয়ে ভাগ করা হলে অবশ্যই মিলে যাবে। প্রত্যেক সুরার শুরুতেই আমরা পড়ি, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', যার মাঝে আছে ১৯টি হরফ। সুতরাং, পবিত্র কুরআনের মোট সুরার সংখ্যা ১১৪টি এবং এই ১১৪-কে ১৯ দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষে মিলে যায়। সত্যি বলতে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য কুরআনের ১৯ সংখ্যাটি নিয়ে আলোচনা করা নয়। বরং আমার উদ্দেশ্য পবিত্র কুরআনের কিছু অন্যন্য গাণিতিক নিদর্শন নিয়ে

আলোচনা করা।

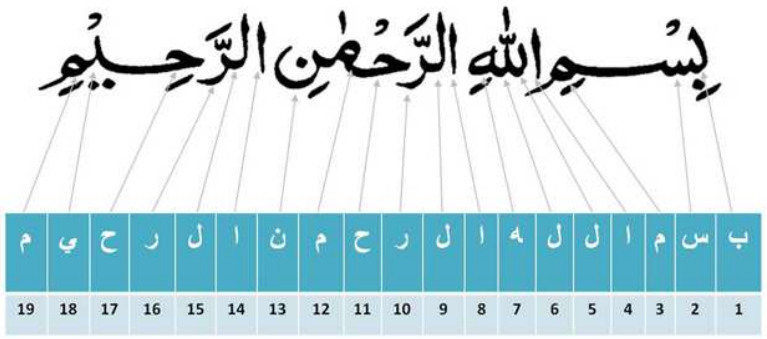

বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানীরা আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে বের করেছেন, মহাকাশের প্রতিটি বস্তু যথাযথ হিসাব অনুসরণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে, যার মধ্যে চাঁদ নিঃসন্দেহে অন্যতম। পবিত্র কুরআনে সুরা রহমানের ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন;

'...চাঁদ হিসাব মতো আবর্তন করে।' চাঁদ পুরো পৃথিবীকে একবার আবর্তন করে আসতে সময় নেয় ২৭ দিন। অপরদিকে, আরবিতে 'কামার' শব্দটি পবিত্র কুরআনে সর্বমোট ২৭ বার উল্লেখিত হয়েছে। কার্যত, 'কামার' অর্থ হল চাঁদ।

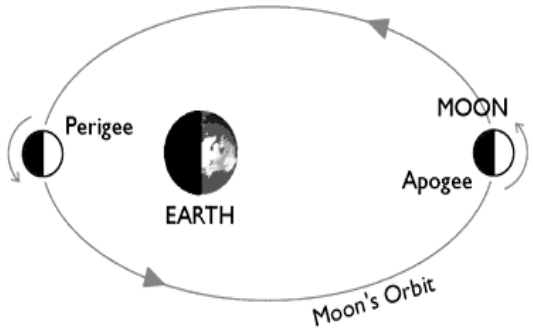

চাঁদের নিজ কক্ষপথে আবর্তন

আমরা প্রায় সবাই জানি, সমগ্র পৃথিবীতে পানির পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৭১% এবং ভূমির পরিমাণ শতকরা ২৯%। পবিত্র কুরআনে 'ভূমি' শব্দটি বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে মোট ১৩ বার এবং 'সাগর' শব্দটি বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে মোট ৩২ বার। তথাপি, (ভূমি + সাগর) = (১৩ + ৩২) = ৪৫। অতএব, পবিত্র কুরআন অনুসারে, ভূমির অনুপাত (১৩ ÷ ৪৫ × ১০০) = ২৮.৮৮৮, যেটা প্রায় শতকরা ২৯% এবং পানির অনুপাত (৩২ ÷ ৪৫ × ১০০) = ৭১.১১১, যেটা প্রায় শতকরা ৭১% নির্দেশ করে।

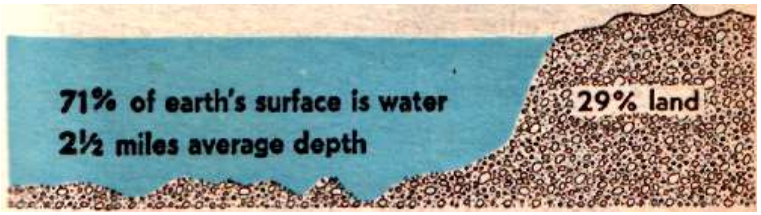

পৃথিবীতে ভূমি ও পানির পরিমাণ

অত্যাধুনিক যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে মহাকাশবিজ্ঞানীরা বের করেছেন, আমাদের পৃথিবী ৪.৫ বিলিয়ন বছরের পুরোনো এবং মহাকাশের বয়স ১৩.৭ বিলিয়ন বছর। তথাপি, মহাকাশ এবং পৃথিবীর বয়সের অনুপাত (১৩.৭:৪.৫) = ৩:১। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে সুরা কাফের ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

'আর আমি তো সৃষ্টি করেছি আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছি ***ছয় দিনে***।'

এ ছাড়াও সুরা হামীম-আস-সাজদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন:

'... যিনি (আল্লাহ্) পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ***দুই দিনে***।'

অতএব, পবিত্র কুরআন অনুসারে, আসমান (মহাকাশ) ও জমিন (পৃথিবী) সৃষ্টি হতে যে

সময় লেগেছে তার অনুপাত (৬:২) = ৩:১। সুতরাং আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞান ও পবিত্র কুরআন অনুযায়ী বোঝা যায়, পৃথিবীর ব্যাপ্তিকাল মহাকাশের ব্যাপ্তিকালের প্রায় ৩ ভাগের ১ ভাগ।

পশ্চিম এশিয়ার তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী এলাকাকে এক সময় গ্রিকরা মেসোপটেমিয়া বলে প্রথম অভিহিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, 'মেসোপটেমিয়া' শব্দটির অর্থও হল 'দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ'। মেসোপটেমিয়ার উত্তর অংশের নাম অ্যাসেরিয়া, দক্ষিণের নাম ব্যাবিলনিয়া। ব্যাবিলনিয়ার উত্তরাংশের নাম আক্কাদ এবং দক্ষিণাংশের নাম সুমের। যাই হোক, প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ভাষাকে বলা হয় 'কিউনিফর্ম'। ১৭০০ সালে, টমাস হাইড নামক একজন পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথম 'কিউনিফর্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ভেঙে দেখান যে এই লিপিটি আসলে কীলকাকার। কেননা, ল্যাটিন cuneus শব্দের অর্থ 'কীলক' আর forma শব্দের অর্থ 'আকার'। স্বভাবিকভাবেই কিউনিফর্ম হল কীলকাকার অক্ষরের সমষ্টি। বিশ্বের অধিকাংশ ভাষাতত্ত্ববিদগণ কিউনিফর্মকে মানব সভ্যতার সর্বপ্রথম লিখিত ভাষা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্ম বা কীলকাকার লিখন পদ্ধতিতে 'গাশতু' নামক একটি শব্দ আছে, যার অর্থ 'ধনুক-নক্ষত্ররা'। পণ্ডিত মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়া 'গাশতু' শব্দটিকে সরাসরি পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত 'শিরা' বা ইংরেজি Sirius হিসেবে বিবেচনা করেন।

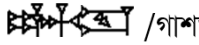 /গাশতু/ = 'ধনুক-নক্ষত্ররা'

/গাশ/ (বহুবচনে অর্থ 'নক্ষত্ররা') + /তু/ (অর্থ 'ধনুক')

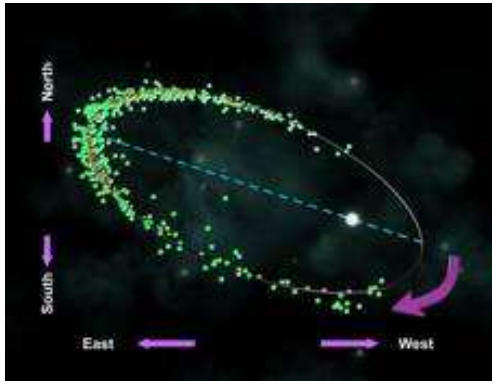

মহাকাশে Sirius-কে দুই ধনুকের ন্যায় চিহ্নিত করা হচ্ছে

ইংরেজিতে Sirius শব্দটিকে আরবিতে শিরা বলা হয়, যেটা প্রকৃতপক্ষে রজনীর আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল একটি তারার নাম। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে বের করেছেন, শিরা বা Sirius আসলে দ্বৈত তারা। তাই বিজ্ঞানীরা এই জোড়-বাঁধা তারাকে Sirius-A এবং Sirius-B নাম দিয়েছেন। এই Sirius-A ও Sirius-B একে অপরের দিকে ধনুকের রূপে গতিপথ অনুসরণ করে এবং প্রতি ৪৯.৯ বছর পর পর একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে মহাকাশে অবস্থান করে। পবিত্র কুরআনে সুরা নাজমের ৪৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন:

'এবং তিনিই (আল্লাহ্) শিরা (Sirius) নামক তারার মালিক।'

অধিকন্তু, এই একই সুরায় ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

'অবশেষে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের দূরত্ব রইল, অথবা আরো কম।'

সুরা নাজমের উপরোক্ত দুই আয়াতের দুটি ক্রমিক নম্বর স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয় যথাক্রমে ৪৯ এবং ৯ হিসেবে, যেটা প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গিত দেয় ৪৯.৯ বছর। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের গণিতবিদ্যা অনুসারেও ৪৯.৯ বছর পর পর Sirius-A এবং Sirius-B একে অপরের নিকটবর্তী হয়।

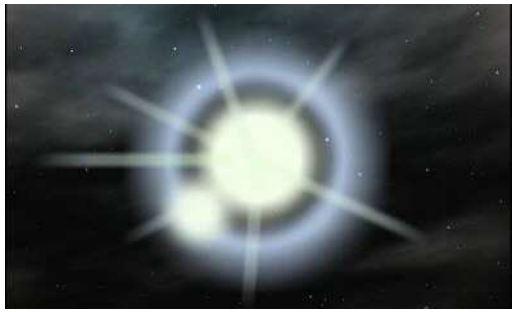

Sirius বা শিরা নামক দ্বৈত তারা

সকল প্রকার পুরুষ মৌমাছির ১৬টি ক্রোমোসোম এবং সকল প্রকার স্ত্রী মৌমাছির ১৬ জোড়া (৩২টি) ক্রোমোসোম রয়েছে। আরবি 'নাহল' শব্দের অর্থ হচ্ছে মৌমাছি। মজার ব্যাপার হলো, পবিত্র কুরআনে সুরা নাহল নামেই একটি সুরা রয়েছে। কার্যত সুরা নাহল পবিত্র কুরআনের ১৬ নম্বর সুরা, যেটা মৌমাছির ১৬টি, অথবা ১৬ জোড়া ক্রোমোসোমের সংখ্যাকে নির্দেশ করে।

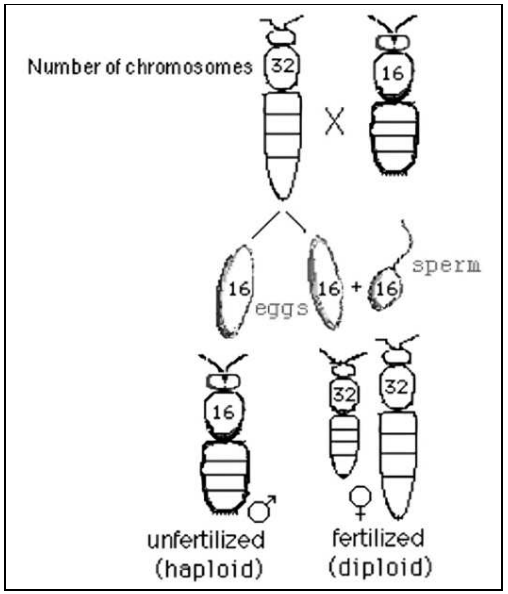

পুরুষ ও স্ত্রী মৌমাছির ক্রোমোসোম সংখ্যা বিশ্লেষণ

এ ছাড়াও মানুষের শরীরে ২৩ জোড়া (৪৬টি) ক্রোমোসোম রয়েছে, যার মধ্যে ২৩টি ক্রোমোসোম আসে পিতার কাছ থেকে এবং বাকি ২৩টি আসে মাতার কাছ থেকে। পক্ষান্তরে সমগ্র পবিত্র কুরআন জুড়ে 'নর' শব্দটি বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে মোট ২৩ বার এবং 'নারী' শব্দটি বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে মোট ২৩ বার। যেটা পরোক্ষভাবে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের ইঙ্গিত বহন করে।

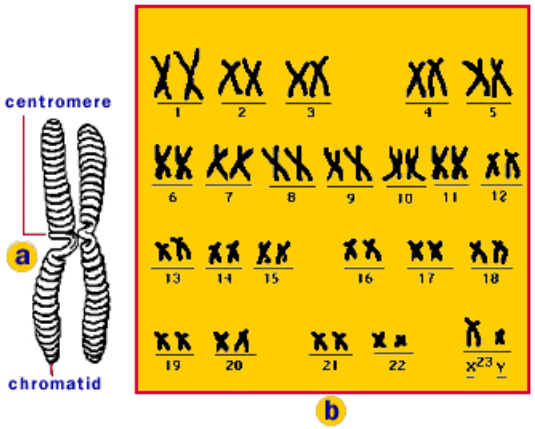

মানবশরীরের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম

গণিতবিদ্যা মানবজাতির গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে, যা থেকে পবিত্র কুরআনও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই, বরং অনেকাংশে এগিয়েই আছে। এই প্রবন্ধটিতে, পবিত্র কুরআন অনুসারে শুধু আমার নিজের জানা গাণিতিক নিদর্শনগুলোই উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও আমি নিশ্চিত, আরো অজস্র গাণিতিক নিদর্শন পবিত্র কুরআনে লুকিয়ে আছে, যা আমি নিজে কেন, হয়তো অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন গণিতবিদ্যায় যে সকল গাণিতিক নিদর্শন বহন করে, তা ত্রুটিহীনভাবে গাণিতিক পারদর্শিতার প্রমাণ রাখে। সব শেষে গণিত শেখানো পবিত্র কুরআনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং এই গাণিতিক শিক্ষা মানবজাতিকে প্রকৃত দ্বিনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম।

পবিত্র কুরআনের কাহিনিগুলো কি সত্যিই প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসরণ করে?

প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাস অনেক পুরাতন, তাই তাদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের একটি সূত্র হলো প্রাচীন গ্রিকবাসীদের মূল্যবান পুরাণসমষ্টি এবং তাদের সুদীর্ঘ পুরাণচর্চা। কার্যত গ্রিক পুরাণের বহু চরিত্র ও কীর্তিকলাপ কল্পিত হিসেবে বিশ্বাস করা হলেও, সেখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রাচীন গ্রিকদের সংগ্রাম, দৈনন্দিন জীবনধারা, সামাজিক রীতি রেওয়াজ এবং কোন দেশে ওরা অতীতে অভিযান করত, ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে জানতে পারি। প্রাচীন গ্রিক পুরাণ সাহিত্যের দুনিয়ায় নিঃসন্দেহে অমূল্য সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে, হোমারের ***ইলিয়াড*** ও ***ওডিসি***, এস্কাইলাসের ***আগামেমনন***, সপহোক্লেসের ***কিং ইডিপাস*** ও ***ইলেকট্রা***, রোমান কবি ভার্জিলের ***ইনিড*** ও ***জর্জিকস*** ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাচীন দেব-দেবী ও মানব-মানবীর বিচিত্র কর্মকাণ্ড, যেমন: যুদ্ধ, প্রেম, লোভ, হিংসা ইত্যাদির নানা উজ্জ্বল কাহিনি আমাদের পৃথিবীর সাহিত্যে সৃষ্টি করেছে স্বপ্নের এক নতুন ভুবন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পবিত্র কুরআনের কাহিনিগুলো কি প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসরণ করে? আসুন দেখা যাক, পবিত্র কুরআনের কাহিনিগুলো আদৌ প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসরণ করে কি না।

প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসারে, একদিন তিন প্রধান দেবতাদের মধ্যে ভাগ্য নির্ধারণী খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তারা হলেন দেবতা জিউস, দেবতা পসাইডন এবং দেবতা হেডিস। দেবতা পসাইডনের ভাগে পড়ল সমুদ্র, পাতালপুরী পড়ল দেবতা হেডিসের অংশে এবং সব শেষে জিউস যথাযোগ্য হলেন সর্বময় শাসনকর্তা, অর্থাৎ দেবরাজ হিসেবে। বস্তুত, জিউস হলেন আকাশের অধীশ্বর, বর্ষণের দেবতা এবং মেঘপুঞ্জ সৃজনকারী। সব মিলিয়ে, জিউসের হাতে রয়েছে ভয়াবহ বজ্র। দেবতা জিউস অন্য সকল দেব-দেবীর মিলিত ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান।

বাম দিক থেকে থেকে জিউস, পসাইডন এবং হেডিস

পক্ষান্তরে, পবিত্র কুরআনে সুরা মায়িদার ৭৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

'তারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী, যারা বলে: আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন। এক উপাস্য ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই...'

এবং, পবিত্র কুরআনে সুরা রাদের ১২ ও ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন:

'তিনিই (আল্লাহ্) তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে, এবং তিনিই (আল্লাহ্) সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। বজ্রনির্ঘোষ ও ফেরেশতারা সভয়ে ওনার মহিমাকীর্তন করে। আর তিনি (আল্লাহ্) বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন। তবু তারা আল্লহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে। অথচ তিনি (আল্লাহ্) মহাশক্তিমান।'

প্রাচীন গ্রিক পুরাণের বিভিন্ন কাহিনিতে, যে দেবতার সবচেয়ে দেখা মেলে তিনি হলেন হার্মিস। দেবতা জিউস হার্মিসকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। হয়তো এই কারণেই গ্রিক পুরাণে, হার্মিস দেববার্তা বাহকরূপে পরিগণিত হন। অপরদিকে কুরআনের বর্ণনা অনুসারে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) নবী-রাসুলদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহি প্রেরণ করতেন। কার্যত, 'ওহি' অর্থ জানিয়ে দেওয়া। পবিত্র কুরআনে সুরা তাকবিরের ১৯ থেকে ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

'নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবহ ফেরেশতার (জিবরাইলের) আনীত বাণী।

যে ফেরেশতা (জিবরাইল) শক্তিশালী, আরশের অধিপতির (আল্লাহ্‌র) নিকট মর্যাদাবান, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যিনি (জিবরাইল) বিশ্বাসভাজন।'

গ্রিক পুরাণে মানুষের ক্রমবর্ধমান অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতা জিউস সারা বিশ্বকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য এক মহাপ্লাবন সৃষ্টি করেন। জিউস চেয়েছিলেন এই মহাপ্লাবনে যেন পৃথিবীর সকল মানব ও দানব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জিউসের ইচ্ছায় পুরো ৯ দিন ধরে ভীষণ বৃষ্টি এবং নদ-নদী সমুদ্র ছাপিয়ে দুর্বার প্লাবনে তলিয়ে গেল পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ ও সকল পাহাড় পর্বত। মানুষ ও দৈত্যদানব ভেসে গেল অশান্ত জলস্রোতে, কেউই রেহাই পেল না। শুধু বেঁচে থাকলেন মানব ডিউক্যালিয়ন এবং তার স্ত্রী মানবী পীরা, কারণ ডিউক্যালিয়নের পিতা টাইটান প্রমিথিউস প্লাবনের পূর্বেই একটি নৌকা বানাতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, একদা নবী হজরত নুহ (আ.) ওনার গোত্রের মানুষদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতে বলেন। মাত্র ৮০ জন নারী-পুরুষ ওনার কথায় আল্লাহ্‌র পথে এলো। বাকি লোকেরা ওনার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে, ওনাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে লাগল। সেই লোকদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নুহ (আ.) আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ জানালেন। তখন আল্লাহ্ ওনাকে জানালেন, কিছুদিনের মধ্যে তুফান আসবে এবং মহাপ্লাবন হবে। অধিকন্তু আল্লাহ্ নুহ (আ.)-কে একটি নৌকা তৈরি করতে আদেশ দিলেন। তখন নুহ (আ.) আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী, একটি বিরাট নৌকা তৈরি করলেন। অবশেষে একদিন তুফানের আলামত দেখা দিল এবং শুরু হলো প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। তারপর নুহ (আ.) ঈমানদার লোকজনদের নিয়ে নৌকায় উঠলেন এবং প্রতিটি জীবজন্তু জোড়ায় জোড়ায় তুললেন এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীও সাথে নিলেন। ৪০ দিন পর মহাপ্লাবন থামল এবং নৌকাটি জুদি পর্বতে এসে থামল।

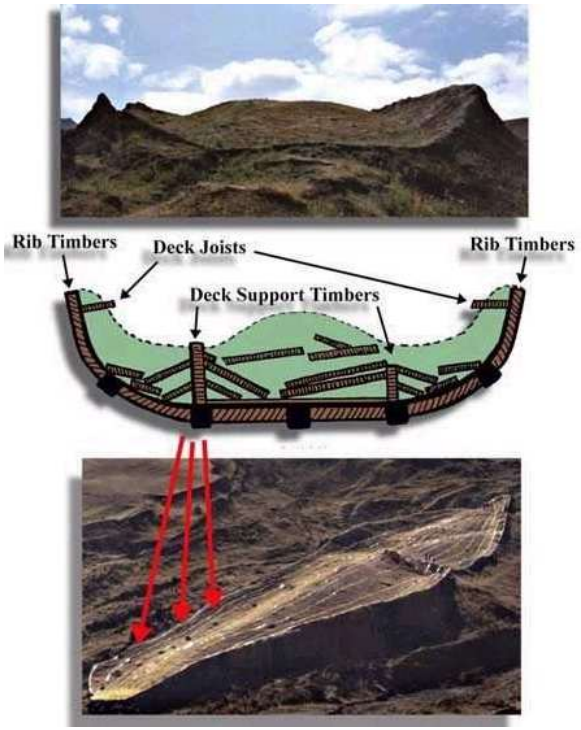

নবী নুহ (আ.)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত নৌকা

১৯৫০ সালের ঘটনা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA)-এর স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহ একটি পর্বতের কাছাকাছি স্থান থেকে আসা মানবচক্ষুর আকৃতি বিশিষ্ট একটি বস্তুর ছবি প্রেরণ করে। তারপর তরুণ মার্কিন ভূ-তত্ত্ববিদ ড. ভেন্দিল জোনসের প্রবল আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসু মন ওনাকে নিয়ে গেল জুদি পর্বতের চূড়ায়। অবশেষে তিনি আবিষ্কার করেন নুহ (আ.)-এর সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নৌকা, যেটা আনুমানিক ৫০০ ফুট লম্বা এবং ৫০ ফুটের অধিক চওড়া। নৌকাটি দীর্ঘদীন পর্বতের অভ্যন্তরে থাকায়, এর মূল আকৃতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুরা কামারের ১৩ থেকে ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

'আমি নুহকে কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌকায় আরোহণ করিয়েছি, যা চলত আমার দৃষ্টির

সামনে। এটা ছিল তার জন্য প্রতিদান, যাকে তারা (কাফেররা) প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি একে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিদর্শন করে রেখেছি। অতএব, কেউ কি আছে যে এই নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে?'

পৌরাণিক গ্রিক কাহিনিতে, গ্রিক নৌবাহিনী যখন ট্রয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন মাঝপথে দেবী আর্টেমিস হাওয়া বন্ধ করে সব গ্রিক জাহাজের গতি রুদ্ধ করে দেন। কারণ, রাজা আগামেমনন পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সবচেয়ে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ওনার সবচেয়ে প্রিয়জনকে দেবী আর্টেমিসের উদ্দেশ্যে বলি দেবেন। পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, আগামেমনন ওনার প্রিয় কন্যা ইফিজিনিয়াকে আর্টেমিসের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসেন। যখন পুরোহিতের নির্দেশে ইফিজিনিয়াকে বলি দিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আর্টেমিস কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে বলিস্থানে একটি হরিণ রেখে, ইফিজিনিয়াকে শূন্যপথে তৌরি নামক স্থানে নিয়ে যান।

মাইসিনির একটি কবর থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণমুখোশে রাজা আগামেমননের প্রতিকৃতি

অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের কাহিনি অনুযায়ী, একদিন মহান আল্লাহ্ তাআলা নবী হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা করতে চাইলেন। ফলে ইবরাহিম (আ.) টানা তিন দিন স্বপ্নে আল্লাহ্র নিকট থেকে আদেশ পেলেন যে, তুমি (ইবরাহিম) তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানি করো। ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ্কে খুশি করার জন্য ওনার (ইবরাহিমের) প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর ইবরাহিম (আ.) ওনার এই সিদ্ধান্তের কথা পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে

জানালেন। ইসমাইল (আ.) এ ব্যাপারে সানন্দে রাজি হলেন। অবশেষে কুরবানির সময় যখন পিতা তার নিজ পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন, ঠিক তখনই আল্লাহ্র ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) কর্তৃক বেহেশত থেকে একটি দুম্বা পাঠালেন, যেটা ইসমাইল (আ.)-এর স্থলে কুরবানি হয়ে গিয়েছিল।

চিরায়ত গ্রিক পুরাণে, একটি বিখ্যাত ঘোড়ার সাক্ষাৎ মেলে যার নাম 'পেগাসাস'। এই ঘোড়াটির দুটি ডানা ছিল এবং এটি ঘূর্ণিঝড়ের মতো অক্লান্ত ও ক্ষিপ্রগতিতে আকাশে ছুটে বেড়াত। দেবী অ্যাথিনির সাহায্যে গ্রিক মহাবীর বেলেরোফোন এই ঘোড়াটির মালিক হন। কিন্তু কালক্রমে অ্যাথিনির দৈব অনুগ্রহের কথা ভুলে গেলেন বেলেরোফোন। পেগাসাসের উপর আরোহণ করে আকাশ ও মাটি জয় করার আনন্দে একধরনের অহংকার জন্ম নিল বেলেরোফোনের মনে। ফলে একদিন, ওনার সশরীরে স্বর্গরাজ্য ভ্রমণের বাসনা জাগল। তারপর বেলেরোফোন পেগাসাসের পিঠে চড়ে সশরীরে স্বর্গযাত্রা করলে, দেবতা জিউস পেগাসাসের পেছনে একটি ডাঁশ লাগিয়ে দেন। সেই ডাঁশের আমড়ে অস্থির পেগাসাস বেলেরোফোনকে তার পিঠ থেকে ফেলে দেয়, এতে হতভাগ্য বেলেরোফেনের মৃত্যু হয়। বেলেরোফোনের মৃত্যুর পর দেবরাজ জিউস পেগাসাসকে নিজের আস্তাবলে নিয়ে যান।

পেগাসাসের ভাস্কর্য

অপরদিকে মুসলমানরা বিশ্বাস করে, পরকালে মানুষ যে সকল দ্রুতগামী ব্যবহার করবে, 'বোরাক' সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। বোরাকের দৈহিক বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে, এটা খচ্চর হতে ছোট এবং গাধা হতে বড়। ইহার কর্ণদ্বয় বেশ চিকন, কাঁধ হিরামনি পান্নায়

সুসজ্জিত, শরীর পশমে ঢাকা, মুখায়ব রূপসী ললনার ন্যায় এবং সজল তার চক্ষু। বোরাক শব্দটি আরবি 'বারকুন' থেকে এসেছে যার অর্থ বিদ্যুৎ। বোরাকের বর্ণও ছিল নির্মল চকচকে বিদ্যুতের ন্যায় এবং সে ছিল বিদ্যুতের মত দ্রুতগতিসম্পন্ন। পবিত্র কুরআনে সুরা নাজমের ৭ থেকে ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন:

'তখন তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে ছিলেন...সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে, যার কাছেই অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। যখন সিদরাতুল মুনতাহাকে আচ্ছাদিত করেছিল, যা আচ্ছাদিত করার ছিল, তখন ওনার দৃষ্টিবিভ্রমও হয়নি, এবং তিনি সীমালঙ্ঘনও করেননি। তিনি স্বীয় রবের মহান নিদর্শনসমূহ দর্শন করেছেন।'

উপরোক্ত আয়াতগুলো বোখারি শরিফের অধ্যায় নম্বর-৪৫ ও হাদিস নম্বর-১৩০১ অনুসারে সংক্ষিপ্ত তাফসির বা ব্যাখ্যা নির্দশ করে যে, মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) মিরাজের সময় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বোরাকে আরোহণ করেন, আল্লাহ্র আরশ 'মালায়ে আলা' পৌছনোর উদ্দেশ্যে মহাকাশ পথে ভ্রমণ করেন এবং একসময় সিদরাতুল মুনতাহায় এসে পৌছান। এ ছাড়াও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত পৌছে বোরাককে ত্যাগ করে 'মালায়ে আলা'-এর উদ্দেশ্যে রফরফে আরোহণ করেছিলেন।

তারপর প্রাচীন গ্রিক পুরাণে, এপিমেনাইডিস নামক একজন কবির দেখা মেলে, যিনি ছিলেন একজন মেষপালক। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। একদিন, এপিমেনাইডিস ওনার হারানো একটি ভেড়া খুঁজতে খুঁজতে একটি গুহার কাছে এসে সেটার ভেতরে ঘুমিয়ে পড়েন। কার্যত তিনি সেই গুহার ভেতরে একটানা ৫৭ বছর ঘুমিয়ে ছিলেন। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুসারে, কিছু ঈমানদার যুবক ওনাদের সময়ের মূর্তিপূজারি শাসকের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে একটি কুকুরসহ আশ্রয় নিয়েছিলেন এক গুহায়। পবিত্র কুরআনে ওনাদের 'আসহাবে কাহাফ' বলা হয়েছে যার অর্থ 'গুহার অধিবাসীগণ'। পবিত্র কুরআনে সুরা কাহাফের ২২ থেকে ২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

'...তারা ছিল তিনজন, চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর, এবং কেউ কেউ বলবে তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর, এ ছিল অদৃশ্য বিষয়ে অনুমাননির্ভর কথা। আবার তাদের কেউ কেউ বলে তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।

আপনি বলে দিন আমার রবই তাদের সংখ্যা খুব ভালো জানেন। তাদের সংখ্যা অতি অল্প লোকেই জানে...ওরা তাদের গুহায় ছিল ৩০৯ বৎসর।'

তুরস্কের এফাসাসে অবস্থিত 'আসহাবে কাহাফ' খ্যাত সেই গুহা

এরপর গ্রিক পুরাণে, দেবতা জিউসের পুত্র ও অভিশপ্ত যে রাজার কথা উল্লেখ আছে, তার নাম ট্যান্টালাস। একসময় ট্যান্টালাসের সাথে দেবরাজ জিউসের ভীষণ ভালো বন্ধুত্ব ছিল। একদিন ট্যান্টালাস দেবতাদের দৈবজ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য স্বীয় পুত্র পিলোপসকে হত্যা করে তার মাংস রান্না করে দেবতাদের খেতে দেন। ট্যান্টালাস আসলে দেখতে চেয়েছিলেন, দেবতারা নরমাংস ও পশুমাংস চিনতে পারেন কি না। কিন্তু সকল দেব-দেবী ট্যান্টালাসের এই নারকীয় ছলনা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলেন। ট্যান্টালাসের এই ভয়াবহ পাপকর্মে ভীষণ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন সকল দেব-দেবী। এরপর দেবতা জিউসের নির্দেশে দেবতা হেডিস ট্যান্টালাসকে পাতালপুরীর টার্টারাসে শাস্তির জন্য নিয়ে যান এবং সেখানে এমন এক স্থানে ট্যান্টালাসকে বেঁধে রাখা হয়, যেখানে ওনার চিবুক পর্যন্ত থৈ থৈ পানি এবং মুখের নাগালেই পাকা ফল। ট্যান্টালাস যখনই ফল খাওয়ার জন্য মুখ বাড়ান, ফলের শাখা তখনই বাতাসে ঝরে যায়। পানির জন্য যখনই তিনি মুখ নিচু করেন, তখনই পানি ধীরে ধীরে নেমে যেতে থাকে। এভাবেই অনন্তকাল ধরে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সদা ক্ষুধার্ত ও সদা পিপাসার্ত ট্যান্টালাসকে।

পবিত্র কুরআনে সুরা রাদের ১৪ নম্বর আয়াতে ট্যান্টালাসের একটি সম্ভাব্য উপমা এভাবে পাওয়া যায়:

'...তাদের উপমা সেই ব্যক্তির (ট্যান্টালাস) মতো, যে তার মুখে পানি পৌঁছে দেওয়ার আশায় এমন পানির দিকে তার হাত দুটো বাড়ায়, যা তার মুখে পৌঁছবার নয়। অবিশ্বাসীদের আহ্বান তো নিষ্ফল।'

ট্যান্টালাসের অনন্ত শাস্তি

বিখ্যাত গ্রিক কবি হোমারের আরো একটি বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম হলো ***ওডিসি***। এই মহাকাব্যের নায়ক হলেন ইথাকার রাজা ওডিসিউস, যিনি সুন্দরী হেলেনের জ্ঞাতিবোন পেনিলোপিকে বিয়ে করেন। ইলিয়াম বা ট্রয়ের যুদ্ধ জয়ের পর স্বদেশে ফেরার পথে, ওডিসিউসের পথভ্রান্তির পরিণতি হিসেবে পেনিলোপিকে সুদীর্ঘ ২০ বছর প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে থাকতে হয়। ওডিসিউসের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত পাণিপ্রার্থীদের ভীষণ চাপের মুখেও পেনিলোপি ওডিসিউসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন এবং নানা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করেন। কার্যত, পিতামহের জন্য একটি কাপড় বোনার নাম করে পেনিলোপি ওনার পাণিপ্রার্থীদের ঠেকিয়ে রাখেছিলেন এই বলে যে, এই কাপড় বোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাউকে বিয়ে করতে করবেন না। সেই কৌশল অনুযায়ী, পেনিলোপি প্রতিদিন সেই কাপড় সারাদিন ধরে বুনতেন এবং রাত্রিবেলা গোপনে সেই কাপড়ের সেলাই খুলে ফেলতেন। পবিত্র কুরআনে সুরা নাহলের

৯১ ও ৯২ নম্বর আয়াতে পেনিলোপির সম্ভবপর উপমা এভাবে পওয়া যায়:

'যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করো তখন তা পালন করবে, এবং আল্লাহ্‌কে জামিন করে নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর তোমরা তা ভঙ্গ করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো। তোমরা হয়ো না সেই নারীর (পেনিলোপি) মতো, যে তার সুতো মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে...'

পেনিলোপির মুখমণ্ডল

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এবার মূল কথায় আসা যাক। তা হল, পবিত্র কুরআনের কাহিনিগুলো প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসরণ করে কি না। ধরা যাক, বিশ্বখ্যাত ব্যাটসম্যান ভারতের শচীন টেন্ডুলকার ডান হাতে ব্যাট করেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যাটসম্যান আশরাফুলও ডান হাতে ব্যাট করেন। প্রিয় পাঠক! আপনারা কি তাহলে বলবেন আশরাফুল সুনিশ্চিতভাবে টেন্ডুলকারকে অনুসরণ করেন? অবশ্যই না। কেননা আপনারা আশরাফুল ও টেন্ডুলকারকে ওনাদের ব্যাট করার দৈহিক ধরন দিয়ে পরীক্ষা করবেন না বরং আপনারা পরীক্ষা করবেন ওনাদের ব্যাট করার শারীরিক ও মানসিক কৌশল ও দক্ষতা দিয়ে। ঠিক একইভাবে প্রাচীন গ্রিক পুরাণের সাথে পবিত্র কুরআনের কাহিনিগুলোতে হালকা কিছু মিল পাওয়ার অর্থ এই না যে, পবিত্র কুরআনের কাহিনিগুলো প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসরণ করে। এ ছাড়াও গ্রিক পুরাণের কাহিনিগুলো

নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক হলেও, সেগুলো বিবিধ অশ্লীল বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ। অপরদিকে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অবিসংবাদিতরূপে অত্যন্ত মার্জিত, যথেষ্ট বোধগম্য এবং বেশ অর্থবহ।

জিনের গাথা, তবে কি কল্পকথা?

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে জিনের অস্তিত্ব নিয়ে রয়েছে নানা রকমের বিভ্রান্তি। ওনাদের একদল জিনের অস্তিত্বে শুধু বিশ্বাসই করেন না, বরং ওনাদের বিশ্বাসের সপক্ষে বিভিন্ন রকম যুক্তি, প্রমাণ এবং অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন। অন্যদিকে আরেক দল বিশেষজ্ঞ এ সকল অলীক বিশ্বাসকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলোকে। 'জিন' শব্দের অর্থ গুপ্ত বা অদৃশ্য। কার্যত, জিন হল মানুষের থেকে আলাদা এক সৃষ্টি, যা লুকিয়ে থাকা, কিংবা চোখের আড়ালে থাকার কারণে তাদের জিন বলা হয়ে থাকে। সুলতান মোহাম্মদ সম্রাট শেখের প্রতিষ্ঠিত 'সালতানিক তত্ত্ব' অনুসারে, জিনদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১. ইচ্ছাধারী জিন: যারা মানুষের সম্মুখে কখনো নিজেদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে না। কেননা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, জিনরা বহুরূপী হতে পারে। ফলস্বরূপ, তারা মানুষ, সাপ, পাখি, কীট এবং বিভিন্ন চতুষ্পদ পশুর আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম।

২. অদৃশ্যমান জিন: যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টির সমীপে আসে না, এবং নিজেদের সর্বদা গুপ্ত রাখতেই ভালোবাসে।

৩. দৃশ্যমান জিন: যারা মানবসমাজেই বাস করে এবং সর্বদা মানুষের সাথে মিশে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ তাদের চিনতে অক্ষম।

৪. কালিক দৃশ্যমান জিন: যারা তাদের ইচ্ছেমতো মানুষের সামনে দৃশ্যমান হয়, এবং তারা চাইলে মানুষের সামনেই অদৃশ্য হতে সক্ষম। এদের দ্বারা মানুষের ক্ষতি সাধন হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

৫. শয়তান জিন: এরা খুবই বিপজ্জনক, কেননা তারা সর্বদা মহান আল্লাহ্ তাআলার

অবাধ্য। অধিকন্তু, এরা ইবলিস শয়তানের সেই সকল ভৃত্য, যারা বিভিন্নভাবে মানুষের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এরা স্বভাবগত দিক থেকে ইচ্ছাধারী হতে পারে, অদৃশ্যমান হতে পারে, দৃশ্যমান হতে পারে এবং কালিক দৃশ্যমানও হতে পারে।

প্রাচীন মিশরীয় জাদুকররা জাদুবিদ্যায় পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ছিল জগৎবিখ্যাত। তাই সেই সময়ের মিশরীয় জাদুকরদের সাথে মিশরীয় শাসকদের সম্পর্ক ছিল বেশ আন্তরিক। মিশরীয় শসকরা পুনরুত্থান এবং মৃত্যুর পরে শাশ্বত জীবনে বিশ্বাস করত। যার ফলে, মৃত্যুর পরে তাদের দেহটি মমি করে সংরক্ষণ করা হত। তারপর তাদের মমীকৃত শরীরটির সাথে মমীকৃত চাকরবাকর, রত্ন ও ধনসম্পদ দেওয়া হত, যাতে পরকালে তাদের কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়। তাই প্রাচীন মিশরীয় জাদুকররা ফেরাউনদের সমাধি এবং ধনসম্পদ রক্ষার জন্য বিভিন্ন পাথর বা রত্নের গায়ে অভিশাপ মন্ত্র খোদাই করে রাখত। যখন ১৯ বছরের শাসক তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কৃত হয়, তখন সেখানে ১৪৩টি মূল্যবান রত্ন পাওয়া যায়। সেই সব রত্নে খোদাই করা ছিল চিত্রলিপি (Hieroglyph)। পরবর্তী সময়ে ***মৃতদের বই*** (Book of the Dead)-এর সাহায্যে সেই চিত্রলিপির অর্থোদ্ধার করা হয়, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ মন্ত্ররূপে হুঁশিয়ারি বার্তা:

'প্রত্যেকটি হাত যা আপনাকে স্পর্শ করে কর্তন করা হবে। প্রত্যেক নাসিকা যা আপনার ঘ্রাণ নেয় ক্ষুদ্রতর হয়ে যাবে। প্রতিটি আঁখি, যা আপনাকে দর্শন করে বিনষ্ট হয়ে যাবে। ধীরস্থিরভাবে জেগে উঠুন, হে মহান রাজা!'

উপরোক্ত এই অভিশাপ মন্ত্রটি সম্পর্কে ডক্টর ইবরাহিম আমীন ওনার লেখা ***জিন এবং মানবব্যাধি*** নামক বইয়ের 'ডাকিনীবিদ্যা ও মায়াবিনীগণ' অধ্যায়ে বলেন, ফেরাউনদের অভিশাপ আসলে কিছুই নয়, বরং এটা হচ্ছে ফেরাউনদের মমীকৃত দেহ, এবং সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী কালো জাদুর সাহয্যে জিন বশীভূতকরণ।

এবার আমার প্রবন্ধের মূল কথায় আসা যাক। প্রাচীন মিশরে তুতেনখামেন নামক শাসকের অভিশাপে অনেক মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। যারাই ধনসম্পদের লোভে ওনার সমাধিতে প্রবেশ করেছে, তাদের জীবনে নেমে এসেছে অভিশাপের ভয়াল থাবা। ঘটেছে বিবিধ করুণ ঘটনা, সে যেন এক অজানা রহস্য। ১৯২২ সালের ২৯ নভেম্বর, জনাব লর্ড কারনারভন এবং জনাব হাওয়ার্ড কার্টার তুতেনখামেনের মমি ও রত্নখনি আবিষ্কার করেন। এরপর জনাব কার্টার যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন তিনি পথে

একধরনের কান্নার মতো আওয়াজ শুনতে পেলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। আর সালতানিক তত্ত্বের আলোকে আমি আগেই বলেছি, অদৃশ্যমান জিন মানুষের সামনে আসে না। তারপর তিনি বাড়িতে পৌঁছে ঘরে ঢোকার সময় দেখেন, ওনার পোষা হলদে পাখিটিকে একটি গোখরা সাপ ওনার চোখের সামনেই সম্পূর্ণ গিলে ফেলে। গোখরা সাপকে ফেরাউনদের ক্ষমতা, কিংবা রক্ষার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়াও আমি আমার প্রবন্ধে আগেই বলেছি যে, শয়তান বা ইচ্ছাধারী জিন সাপের রূপ ধারণ করতে সক্ষম।

তুতেনখামেনের মমির পাশে জনাব হাওয়ার্ড কার্টার

এবার জনাব কারনারভনের ব্যাপারে আসা যাক। কারনারভন ফেরাউনদের অভিশাপকে সর্বদা কুসংস্কার হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি তুতেনখামেনের সমাধিসৌধে প্রবেশ করার দুই মাসের মধ্যে মারা যান। ১৯২৩ সালের ৫ এপ্রিল, কায়রোর হোটেলে ওনার মৃত্যু হয়েছিল। পরে জানা যায়, একটি মশার কামড়েই ওনার মৃত্যু ঘটে। বস্তুত ফেরাউন তুতেনখামেনের মমির পাশে ছিল একটি মশার প্রতিমূর্তি। শয়তান কিংবা ইচ্ছাধারী জিনের পক্ষে একটি কীট হিসেবে মশার রূপ ধারণ করা অসম্ভব কিছু নয়। কারনারভনের মত্যুর পর ওনার পুত্র হঠাৎ একদিন ছায়া-রমণীকে দেখতে পেলেন। সেই অজানা রহস্যময়ী নারী মৃদুকণ্ঠে ওনাকে বলেছিল: 'যদি তুমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে না চাও, তবে কোনো দিন তোমার বাবার কবরের কাছে যেও না।' কারনারভনের ভীত পুত্র

কথা রেখেছিলেন এবং জীবনে কখনো তার বাবার কবরের নিকটবর্তী হননি। স্বভাবগত দিক বিবেচনা করে, এই ছায়া-রমণীকে শয়তান বা কালিক দৃশ্যমান শ্রেণির জিন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

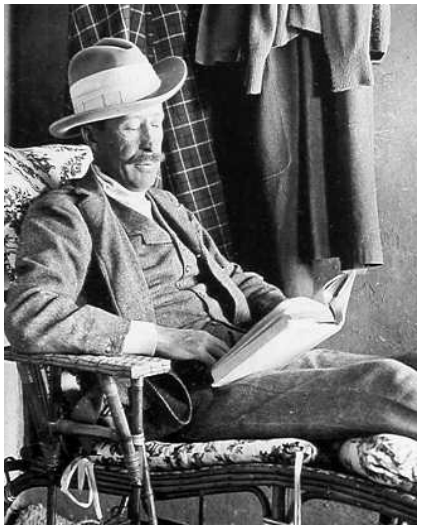

জনাব লর্ড কারনারভন

কারনারভনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জর্জ গোল্ড ওনার মৃত্যুর খবর শুনে কায়রো আসেন এবং তুতেনখামেনের সমাধি দেখতে যান। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বাধ্য হন। তুতেনখামেনের মমির এক্স-রে যিনি করেন, উনিও কয়েক দিন পর মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে আরো অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। কারনারভনের অভিযানের সময় যেসব সদস্য তুতেনখামেনের সমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন, যাদের মধ্যে মাত্র দুজন জীবিত ছিলেন। সেই দুজনের একজন রিচার্ড এডামসন ১৯৭০ সালের এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি ফেরাউনদের অভিশাপে বিশ্বাস করেন না। এরপর টেলিভিশন স্টুডিও থেকে বাড়ি ফেরার পথে, ওনার গাড়ি এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। যার ফলে, ওনার অনাকাঙ্ক্ষিত করুণ মৃত্যু ঘটে। ১৯৮০ সালে, ইংল্যান্ডের একটি টেলিভিশন দল তুতেনখামেনের সমাধিতে এসে তার রত্নভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে একটি ছবির শুটিং শুরু করে। এই ছবিটির নাম দেওয়া হয় 'রাজা তাতের অভিশাপ'। এই ছবিটির নায়ক যখন একটি পুরোনো গাড়ি করে

পাহাড়ি পথে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ফলে সেই নায়কের পায়ের হাড় ভেঙে যায়। এ ঘটনাতে টেলিভিশন দলের সদস্যরা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে ছবিটির শুটিং বাতিল করতে হয়। তথাপি এ সকল দুর্ঘটনা অদৃশ্যমান শয়তান জিনদের দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকতে পারে।

বামে তুতেনখামেনের প্রকৃত মুখমণ্ডল এবং ডানে ওনার মমীকৃত মুখমণ্ডল

আরো একটি ঘটনায় উল্লেখ করার মতো। ১৮৯০ সালের শেষের দিকে, ডগলাস নামক এক ব্যক্তি 'আমুন-রা' নামক প্রাচীন মিশরীয় দেবতার যাজিকা চিসেরকারা (Tcheser-Ka-Ra)-এর মমি কেনেন। তারপর মিশরের নীল নদে বন্ধুদের সাথে নৌকাতে ভ্রমণের সময় ডগলাসের নৌকাটি ঝড়ের কবলে পড়ে। নৌকাটি এদিক-ওদিক দোল খেতে শুরু করলে, হঠাৎ ডগলাসের হাত তার বন্দুকের ট্রিগারে ধাক্কা খায় এবং বন্দুক থেকে গুলি ছুটে এসে তার ডান হাতে লাগে। যার ফলে ডগলাসকে চিরদিনের জন্য নিজের হাতটি হারাতে হয়। এরপর ডগলাস চিসেরকারার মমিটি তার এক বান্ধবীকে দিয়ে দেন। যে মুহূর্তে ডগলাসের বান্ধবী মমিটিকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, সাথে সাথে ওনার মা দোতালার বারান্দা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন এবং সাত দিনের মধ্যে মারা যান। এ ছাড়াও ডগলাসের বান্ধবীর চারটি পোষা কুকুর ছিল, যারা একে একে উন্মাদ হতে থাকে। কথিত আছে যে, কুকুর জাতীয় প্রাণীরা সাধারণত অদৃশ্যমান শয়তান জিনের উপস্থিতি অনুধাবন করতে পারে এবং উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করে। একসময় সেই

কুকুরগুলোর এমন অবস্থা হয় যে, তাদের বাধ্য হয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

তারপর ডগলাসের বান্ধবী চিসেরকারার মমিটি ডগলাসকে ফিরিয়ে দেন এবং নিজে এক অজানা রোগে আক্রান্ত হন। পরবর্তী সময়ে, ডগলাসের বান্ধবী নিজের দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেতে আত্মহননের পথ বেছে নেন। তখন ডগলাস এই মমিটি ওনার এক বন্ধুকে দেন ব্রিটিশ জাদুঘরে রেখে দেওয়ার জন্য। পরে ডগলাস জানতে পারেন, ওনার যে বন্ধু মমিটি বহন করে ব্রিটিশ জাদুঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাকে একদিন বিছানায় একদম মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই মৃত্যুর কোনো কারণ ছিল কি না, কেউ আজ পর্যন্ত বলতে পারেনি। একসময়, ব্রিটিশ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ হয়তো মমিটিকে আর নিজেদের কাছে রাখতে চাইল না। তারা ভাবল এটাকে উপহারস্বরূপ নিউইয়র্কে পাঠাবে। তাই মমিটিকে পাঠানো হলো টাইটানিক জাহাজে। এই জাহাজটি ১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল, একটি ভাসমান হিমশৈলের সাথে ধাক্কা খেয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায়। এই ঘটনাতে প্রায় দেড় হাজার যাত্রী মৃত্যুবরণ করে। এটিকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

LA MOMIE FATALE!

টীকা: এই ছবিটিতে প্রাচীন মিশরীয় যাজিকা চিসেরকারার মমীকৃত দেহের শবাধার দেখা যাচ্ছে। বস্তুত এই ছবিটি টাইটানিক জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বে ১৯১২ সালের ১৪ জানুয়ারি ***নস লইসিরস*** (Nos Loisirs) নামক ফরাসি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাতে এই অভিশপ্ত মমিটি সম্পর্কে সতর্ক করা হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, কীভাবে এই মমিটি অসংখ্য মানুষের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। পরবর্তী সময়ে ধারণা করা হয়, টাইটানিক জাহাজও হয়তো এই মমিটির নির্মম অভিশাপের শিকার।

এখন দৃশ্যমান জিনের প্রসঙ্গে আসি। যারা মানবসমাজেই বাস করে, সর্বদা মানুষের সাথে মিশে থাকে এবং জিন হিসেবে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় কোনোভাবেই প্রকাশ করে

না। এ প্রসঙ্গে জনাব মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ অনূদিত *পৃথিবীতে আজও যা রহস্য* বইয়ে বিবৃত ভারতের কলকাতার একজন খ্যাতনামা ফকির জোতু সাহেবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি অনেক দিন ধরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে একভাবে নেচে গেছেন, যা সর্বদা দর্শকদের মুগ্ধ করত। প্রতিবছর ওনার এই আগুন নাচে অংশ নেওয়ার পর, ওনার পায়ের পাতা ভালোভাবে পরীক্ষা করা হত। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, ওনার পায়ে কোথাও ফোস্কা বা পোড়ার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এমনকি তিনি যে পোশাক পরিধান করে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করতেন, সেই পোশাকেও আগুন তার পোড়া চিহ্ন রাখতে সক্ষম হতো না। বিজ্ঞানীরা এখনো বুঝতে পারেননি, ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপের মধ্যেও, কীভাবে মানুষের দেহের চামড়া ও সুতির কপড়ের টুকরো পুড়ে যায় না। এই প্রশ্নের উত্তরে, পবিত্র কুরআনে সুরা আর-রাহমানের ১৫ নম্বর আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে:

'আর তিনিই (আল্লাহ্) জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দিয়ে।'

যেহেতু জিনেরা আগুনের শিখা দ্বারা সৃষ্ট, তাই পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফকির জোতু সাহেবকে আপাতদৃষ্টিতে জিন হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও যেতে পারে। কেননা আগুনের ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপকে মোকাবেলা করে নিজের দেহ ও পোশাক রক্ষা করা একমাত্র জিনের পক্ষেই সম্ভব। এখন আমার এই কথাটির বিরোধিতা করে অনেকেই পবিত্র কুরআনে সুরা জিনের ৮ ও ৯ নম্বর আয়াত আমার সামনে উপস্থাপন করতেই পারেন, সেটা হল:

'আমরা (জিনরা) আসমানের সংবাদ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম তা পরিপূর্ণ কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা, আর পূর্বে আমরা সংবাদ শ্রবণ করার জন্য আসমানের বিভিন্ন ঘাটিতে গিয়ে বসে থাকতাম, কিন্তু এখন কেউ আসমানের সংবাদ শুনতে চাইলে, সে তার জন্য প্রস্তুত এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড পায়।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আগুনের সৃষ্ট জিন যদি আগুনের ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়, তাহলে জিনেরা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড সহ্য করতে কোনো সক্ষম নয়? এখন এই প্রশ্নের উত্তরে, আমি পবিত্র কুরআনে সুরা আর-রহমানের ১৪ নম্বর আয়াতটি তুলে ধরবো:

'তিনিই (আল্লাহ্) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির পাত্রের মতো শুষ্ক মাটি থেকে।'

এখানে 'পোড়া মাটির পাত্রের মতো শুষ্ক মাটি' বলতে, মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদানকে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজে আদৌ পোড়া মাটির পাত্রের মতো শুষ্ক মাটি নয়। ঠিক তেমনি জিনেরাও আগুনের উপাদানে সৃষ্ট, কিন্তু জিন মানেই আগুন নয়। এ ছাড়াও মাটির তৈরি কোনো জ্যান্ত মানুষকে যদি জীবিত অবস্থায়ই মাটিতে কবর দেওয়া হয়, তাহলে সেই মানুষটির পক্ষে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

তাই আমি নিজেও পাল্টা প্রশ্ন তুলতে পারি—মাটির মানুষকে জীবিত অবস্থায় মাটিতে কবর দিলে, যদি সেই মাটিই তার মৃত্যুর কারণ হয়, তাহলে আগুনের সৃষ্ট জিনের মৃত্যু জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দ্বারা হবে না কেন? তবে এর উত্তর যা-ই হোক না কেন, মানুষ মাটি দ্বারা এবং জিন আগুন দ্বারা সৃষ্ট হলেও, তাদের মৃত্যু সম্পাদনের পরিস্থিতি এই উদাহরণদ্বয়ের ক্ষেত্রে একেবারেই ভিন্ন।

এসকিমোদের কথা আমরা প্রায় সবাই কমবেশি জানি। এই এসকিমোদের ঘিরে একটি ঘটনা আমাদের অনেকের মনেই আতঙ্ক এবং শিহরণে আবিষ্ট করে রেখেছে। এই রহস্যময় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩০ সালে। কানাডার চার্চিল পুলিশ স্টেশন থেকে ৫০ মাইল দূরে আনজিকুন গ্রামে ছিল এসকিমোদের বসতি। একদিন সকালে দেখা গেল, গ্রামের সমস্ত লোকজন হঠাৎ হাওয়াতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আশপাশে কোথাও তাদের চিহ্ন নেই। এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্তও, তাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া ১৮৮৫ সালে তদানীন্তন ফরাসি ইন্দো-চায়না বা বর্তমানের ভিয়েতনামে এ ধরনের আরো একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। তখন সেই অঞ্চলটি ছিল ফরাসিদের অধীনে। একদিন ৬০০ ফরাসি সৈন্য সায়গনের দিকে এগিয়ে চলছিল। যখন তারা তাদের সেনানিবাস থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরে, তখন এই বাহিনী অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ওনারা ভাবতেই পারেননি যে, কীভাবে ৬০০ সুসজ্জিত সৈন্য চেখের সামনে থেকে হারিয়ে যেতে পারে। তারপর ১৯৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর, চীন দেশের নানকিং শহরের দক্ষিণাংশে বিকেল ২টা থেকে ৩টার মধ্যে শেষবারের মতো চীনা সৈন্যবাহিনীকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরে তাদের আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। যেখানে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়, সেখানে তাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রগুলো পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময় জাপান নানকিং শহর আক্রমণ করে। প্রথমে চীনা

কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন যে, জাপান হয়তো এ সকল চীনা সৈন্যদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে নিয়ে গেছে। কিন্তু পরে জানা যায়, জাপানিরা একজনও চীনা সৈন্যকে বন্দি করেনি। এখনো এই ঘটনাটি একটি রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে। এখন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এ সকল মানুষগুলো সেই সব কালিক অদৃশ্যমান জিনদেরই ইঙ্গিত দেয়, যারা তাদের ইচ্ছেমতো মানুষের সমনেই দৃশ্যমান হয় এবং তারা চাইলে মানুষের সামনেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

১৯০৮ সালে সমস্ত ইংল্যান্ড জুড়ে চলছিল ভোটযুদ্ধ। সেই সময় হাউস অব লর্ডসে সরকার দলের সকল সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু স্যার করন রাউস নামক একজন সদস্যের পক্ষে সেখানে উপস্থিত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। পরে যখন ভোটাভুটি করা হলো, তখন দেখা গেল তিনি সেখানে উপস্থিত। সকলে ওনাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কীভাবে একজন নিদারুণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, ঠিক একই সময়েই ওনার আরেক সত্তা হাউস অব লর্ডসে উপস্থিত ছিল।

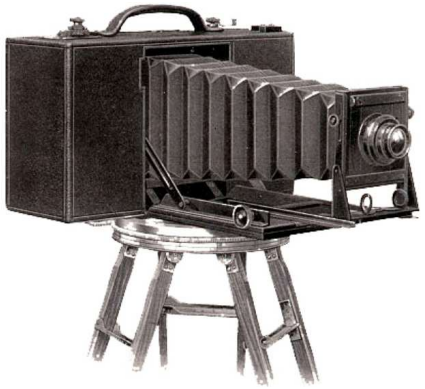

প্যানারামিক ক্যামেরা

এ ছাড়া প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল কানাডাতে। ১৮৬৫ সালের ১৩ জানুযারি, অ্যাসেম্বলি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া একটি অধিবেশনের আয়োজন করেছিল ভিক্টোরিয়া শহরে। সেখানে চালর্সফুট নামক একজন ব্যক্তি ভীষণ অসুস্থতার মধ্যে দ্বৈত সত্তার সাহায্যে সংসদে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে ওনার একটি ছবিও নেওয়া হয়েছিল। অথচ একই সময়ে তিনি হাসপতালে শুয়ে সম্ভাব্য মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিলেন।

সালতানিক তত্ত্বের আলোকে, আমি আমার প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, ইচ্ছাধারী জিনেরা বহুরূপী হতে পারে, তাই তাদের পক্ষে যেকোনো মানুষের রূপ ধারণ করা আদৌ অসম্ভব কিছু নয়। এখন এই ছবি তোলার বিষয়ে অনেকেই বিরোধিতা করতে পারেন, কেননা আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ইস্টম্যান নামক একজন আবিষ্কারক ক্যামেরা আবিষ্কার করেন ১৮৮৮ সালে। অতএব, যদি ১৮৮৮ সালে সর্বপ্রথম ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, তাহলে ১৮৬৫ সালে (ক্যামেরা আবিষ্কারের প্রায় ২৩ বছর পূর্বে) চালর্সফুটের ছবি তোলা কী করে সম্ভব হলো? প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৮ সালে আদৌ সর্বপ্রথম ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়নি, বরং ১৮১৪ সালে 'ক্যামেরা অবস্কুরা' নামক ক্যামেরা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন ফরাসি আবিষ্কারক যোসেফ নিপস। ১৮৬৫ সালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সবচেয়ে অত্যাধুনিক ক্যামেরা ছিল 'প্যানারামিক ক্যামেরা', যেটা ১৮৫৯ সালে বিকশিত করেন ঠমাস সাটন নামক একজন ইংরেজ আলোকচিত্রী।

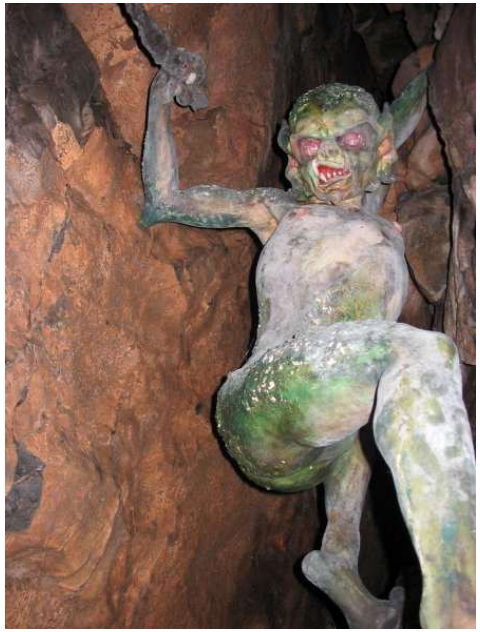

আরব আমিরাতে জালিয়াহর একটি গুহায় আধুনিক ক্যামেরায় তোলা সম্ভাব্য আসল জিনের চিত্র

মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতে, বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে জিন জাতির সৃষ্টিও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। বস্তুত ওনার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অনুধাবন করা সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। অদৃশ্য জগতের সৃষ্টি রহস্যের কথা বাদ দিলেও, দৃশ্য জগতেও আল্লাহ্ তাআলার যে সকল অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য সৃষ্টি রয়েছে, সেগুলোর রহস্যও মানুষের নিকট হয়তো চিরদিনই অজানা থেকে যাবে। আল্লাহ্ মানব সৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন জিনজাতি। সর্বজনগত ইসলামিক জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে, আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে পার্থিব মানবজাতি। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে সুরা যারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে কেবলমাত্র এই জন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।'

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, তথাকথিত বিজ্ঞানমনা অনেক শিক্ষিত ভাই ও বোন জিনদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, কারণ ওনারা জিনদের নিজেদের চোখে দেখতে পান না। যদিও 'জিন' শব্দটির প্রচলিত অর্থই হলো অদৃশ্য বা গুপ্ত। অধিকন্তু, আমাদের মানবসমাজে এমন কিছু ঘটনাও ঘটে, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। তার পরও, আমার এই প্রবন্ধটিতে সালতানিক তত্ত্বের আলোকে এবং কিছু প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের মাধ্যমে যতটা সম্ভব, আমি জিনজাতির অস্তিত্ব প্রকল্পিতভাবে প্রমাণের চেষ্টা করেছি।

পবিত্র কুরআনের লেখক ভবিষ্যতে মানুষের চাঁদে পদচিহ্ন রাখার ব্যাপারে আদৌ কি অবগত?

পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, তা দেখে মানুষেরও একদিন সাধ জেগেছিল আকাশে ওড়ার। বিমান আবিষ্কারের ফলে মানষের সে সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মানুষের উচ্চাভিলাষের শেষ নেই। জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে বিমানচারী মানুষের পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে হয়, কারণ মানুষ প্রকৃতিরই সন্তান। ছোট বাচ্চাদের যেমন পিতা-মাতারা দূরে কোথাও যেতে দেয় না, ঠিক তেমনি পৃথিবীও তার আপন কোল থেকে মানুষকে দূরে যেতে দিতে নারাজ। তবুও মানুষ প্রতিনিয়ত এই নীড়ের বাঁধন ত্যাগ করে অজ্ঞাতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চায়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ চাইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির সীমা অতিক্রম করে দূরকে আরো নিকট করতে এবং চাঁদকে জয় করতে।

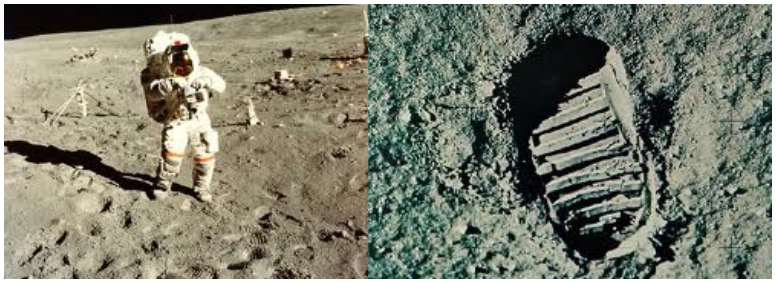

চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন

হাজারের পর হাজার বছর ধরে, চাঁদ ছিল সর্বদা মানুষের স্বপ্ন ও সৌন্দর্য। চাঁদের কিরণে অভিহিত হয়ে, কবি মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়া ওনার 'কে সে জন?' নামক পিরামিডাল কবিতায় লিখেছেন:

'চিরকাল তাপন ঘুরে, তার আপন কক্ষ জুড়ে, শুধুই দ্যুরে উদিত হয়,
প্রিয়ার আস্যে পাই খুঁজে সদা, উপমা শশীর, করেছে সুর যারে জ্যোৎস্নাময়।'

এভাবেই, কবিরা চাঁদ নিয়ে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন এবং কখনো কখনো নিজের প্রিয়তমার সুন্দর মুখমণ্ডলকে চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। বস্তুত, চাঁদ যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষের ঔৎসুক্য ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। ফলস্বরূপ, মানুষ চাঁদকে কাছে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠল। দেখতে হবে চাঁদ কী? চাঁদে কী আছে? এভাবেই আরম্ভ হলো চাঁদকে মুঠোয় পাওয়ার চলমান অভিযান।

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, প্রায় ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে নবাব টিপু সুলতান ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন রকেট ব্যবহার করেছিলেন। এই অভিনব বস্তুটি ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে, তারা এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছিল। হিটলারের সময়কালে জার্মানির পেনমুন্ডের ভূগর্ভস্থ গবেষণাগারে এই সম্পর্কে সাফল্যজনক গবেষণা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর, জার্মান বিজ্ঞানীদের অনেকেই আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে বন্দি হন। তারপর এ সকল বিজ্ঞানীর সহায়তায় উভয় দেশেই এ বিষয়ে গবেষণা চলতে থাকে। কিন্তু এতে প্রথম সাফল্য ছিল রাশিয়ার। কার্যত, চাঁদে অভিযানের ক্ষেত্রে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বছর। কারণ এ বছরেই রাশিয়া 'স্পুটনিক-১' নামক কৃত্রিম উপগ্রহটি রকেটের সাহায্যে মহাকাশে উৎক্ষেপিত করে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়। পবিত্র কুরআনের সুরা মারইয়ামের ৫৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

'এবং আমি তাকে (নবী ইদরিসকে) উত্তোলিত করেছিলাম একটি সুউচ্চ স্থানে (মর্যাদা বোঝাতে)।'

প্রকৃতপক্ষে, আমরা প্রায় সবাই জানি পবিত্র কুরআনকে মুসলমান ও বিধর্মী নির্বিশেষে প্রত্যেকেই সর্বোত্তম আরবি সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআন কাব্যিক ও ছন্দময় ছাড়াও, এটা বহন করে সাহিত্যের সর্বোচ্চ অলংকার। তাই উপরোক্ত সুরা মারইয়ামের ৫৭ নম্বর আয়াতে আন্ডারলাইন করা 'তাকে' দ্বারা সম্ভবত রূপক হিসেবে বোঝানো হয়েছে 'স্পুটনিক-১' এবং 'একটি সুউচ্চ স্থানে' বলতে হয়ত রূপক হিসেবে বোঝানো হয়েছে 'মহাকাশ'। এখন প্রশ্ন হলো, এই রূপক আসলে কী? বস্তুত, রূপক হল সাহিত্যের একটি বিশেষার্থবোধক শব্দ এবং এটা সাহিত্যের এমন একটি অঙ্গ, যার মাধ্যমে চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশ নিজেদের আপাত অর্থকে অতিক্রম করে সমান্তরালভাবে অন্য চরিত্র, ঘটনা এবং পরিবেশকে তুলে ধরে। অতএব, এখন যদি

পবিত্র কুরআনের সুরা মারইয়ামের ৫৭ নম্বর আয়াত রূপকহীনভাবে সাধারণ উক্তি হিসেবে সাজালে দাঁড়ায়:

'এবং আমি স্পুটনিক-১-কে উত্তোলিত করেছিলাম মহাকাশে।'

প্রকৃতপক্ষে, এটা বাহ্যিকভাবে পবিত্র কুরআনের রূপকধর্মী অভিব্যক্তি, যা কেবল প্রজ্ঞাবানরাই অনুধাবন করতে সক্ষম। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ই-ইমরানের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন:

'তিনিই আপনার প্রতি এ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। এতে আছে কতগুলো দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত, সেগুলো হলো গ্রন্থের আসল অংশ, আর অন্যগুলো হলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা-কুটিলতা আছে, কেবল তারাই ফিতনা সৃষ্টি ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে, যা রূপক তা অনুসরণ করে। আর তার ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে: আমরা এতে বিশ্বাস করি। এসবই আমাদের প্রভুর তরফ থেকে এসেছে। জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।'

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। সুরা মারইয়ামের ৫৭ নম্বর আয়াত পবিত্র কুরআনের ১৯ নম্বর সুরা হতে নেওয়া হয়েছে। অতএব, পবিত্র কুরআনের সুরা মারইয়ামের ৫৭ নম্বর আয়াত সংক্ষিপ্ত সংখ্যার প্রসঙ্গ হিসেবে অনুপাতরূপে সাজালে দাঁড়ায় '১৯:৫৭'। প্রিয় পাঠক! আপনারা কি বুঝতে পারছেন, '১৯:৫৭' সংখ্যাটি আসলে কী? প্রকৃতপক্ষে '১৯:৫৭' সংখ্যাটি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দকে নির্দেশ করে, কেননা সেই বছরেই 'স্পুটনিক-১' নামক কৃত্রিম উপগ্রহটি রকেটের সাহায্যে সর্বপ্রথম রাশিয়া কর্তৃক মহাকাশে উৎক্ষেপিত হয়, যা ছিল মানুষের চন্দ্র বিজয়ের ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ধাপ। বর্তমানে আমাদের পৃথিবীর চারপাশে 'স্পুটনিক-১' ছাড়াও বহুসংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ অবস্থান করছে।

স্পুটনিক-১

পবিত্র কুরআনে সুরা আর-রাহমানের ৩৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ পৃথিবীতে বসবাসরত জিন ও মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

'হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও জমিনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার, তবে বের হয়ে যাও। কিন্তু, তোমরা ক্ষমতা ব্যতীত বের হতে পারবে না।'

উপরের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মহান আল্লাহ্ মানুষকে জমিনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। বস্তুত যে ক্ষমতার সর্বপ্রথম বাস্তবায়ন করেন রাশিয়ান নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল সকাল ৯টা ৭ মিনিটে, তাজাকিস্তানের একটি কেন্দ্র থেকে, গ্যাগারিন 'ভোস্টক' নামক একটি মহাযানে আরোহণ করে মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন। গ্যাগারিন মোট ১০৮ মিনিট শূন্যে অবস্থান করেছিলেন এবং পৃথিবী থেকে ৩৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত ওপরে উঠে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘণ্টায় ২৮ হাজার ৯০ কিলোমিটার বেগে সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে একবার প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এই পৃথিবীটাকে একবার ঘুরে আসতেই ওনার সময় লেগেছিল ৮৯.৩৪ মিনিট। সেই সময় থেকেই গ্যাগারিন বহুল পরিচিতি লাভ করেন, কেননা তিনি গোটা বিশ্বের সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি মহান আল্লাহর ভাষায় 'জমিনের সীমা' অতিক্রম করে মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছেন।

ইউরি গ্যাগারিন

মহাশূন্যে ভ্রমণের পর, রাশিয়া এবং আমেরিকা একে অপরের সাথে প্রবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে আমেরিকা দ্রুত সাফল্য অর্জন করে। চাঁদে প্রথম মানুষ অবতরণের কৃতিত্ব আমেরিকার। 'অ্যাপোলো-১১' নামক নভোযানে চড়ে চাঁদের দেশে পাড়ি দেন তিনজন নভোচারী, যারা হলেন নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স, এবং এডউইন অলড্রিন। প্রায় দুই লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল অতিক্রম করে ওনারা তিন দিন পর চাঁদের দেশে পৌঁছান। তখন রাত ১২টা বেজে ১৭ মিনিট ৪১ সেকেন্ড। মূল যান কলম্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চন্দ্রতরি ঈগল চাঁদের বুকে অবতরণ করে। নিল আর্মস্ট্রং ঈগলের জানালা খুলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করেন। মানবজাতির রূপকথার সেই দেশ, চাঁদের দেশ, প্রসারিত ঊর্মিহীন ধূলিময় মরুভূমি ওনার সামনে দৃশ্যমান। ঈগলের মইয়ের ৯টি ধাপ বেয়ে, আর্মস্ট্রং সর্বপ্রথম মানুষ হিসেবে বাংলাদেশ সময় প্রায় সকাল ৮টা বেজে ৫৬ মিনিটে চাঁদের বুকে নিজের পদচিহ্ন আঁকেন। এই বিজয়ের দিনটি ছিল ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই। আরবি ভাষায় 'কামার' অর্থ চাঁদ। পবিত্র কুরআনে 'সুরা কামার' নামে একটি সুরা রয়েছে। সুরা কামারের সর্বপ্রথম আয়াত থেকে আরম্ভ করে, পবিত্র কুরআনের সমাপ্তি পর্যন্ত আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৮৯টি, যেটা আরবি বৎসরের ১৩৮৯ হিজরিকে নির্দেশ করে। তারপর আরবি বৎসরের ১৩৮৯ হিজরি ইংরেজি বৎসরের ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের প্রতিনিধিত্ব করে, কেননা এই ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দেই মানুষ সর্বপ্রথম চাঁদের বুকে পা রেখেছিল।

বাম দিক থেকে থেকে নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স এবং এডউইন অলড্রিন

পবিত্র কুরআনে সুরা কামারের ১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন:

'...চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।'

উক্ত আয়াতের একটি বিশেষ তাফসির বা ব্যাখ্যা রয়েছে। একদিন জ্যোৎস্নাভরা রাতে, মক্কার কাফেররা মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-কে পরীক্ষা করার জন্য বলল, হে মোহাম্মদ (সা.)! আপনি যদি প্রকৃত নবী হয়ে থাকেন, তাহলে ওই দূর আকাশের চাঁদকে ইশারা করুন দেখি। আপনার ইশারায় চাঁদে কিছু ঘটে কি না আমরা দেখব। রাসুল (সা.) তাদের এই চুনোতি গ্রহণ করে চাঁদের প্রতি আঙুল ইশারা করলেন। ফলে সাথে সাথেই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে আকাশের দুই প্রান্তে চলে যায় এবং একটু পরে খণ্ডিত অংশদ্বয় পুনরায় জোড়া লেগে যায়। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল কাফেররা এবং সাহাবিগণ। একটি বহুল প্রচলিত শ্রুতিকথা থেকে জানা যায়, নিল আর্মস্ট্রং নবীজি (সা.)-এর জীবনী হয়তো জানতেন, কেননা চাঁদের বুকে একটি দ্বিখণ্ডিত রেখা পর্যবেক্ষণ করে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এটাকে একটি অতি সাধারণ মিথ হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়।

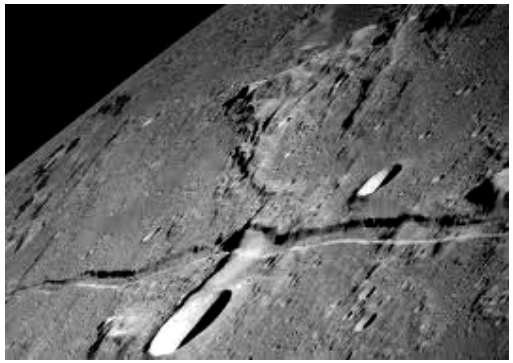

NASA'র তোলা ছবিতে এটা চাঁদের সেই দ্বিখণ্ডিত রেখা হলেও হতে পারে

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের নিশ্চয়ই এটা বুঝতে বাকি নেই যে, পবিত্র কুরআনের একমাত্র লেখক সেই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত আর কেউ নয়। এ ছাড়াও আশা করি, আপনারা এটাও বুঝতে পেরেছেন যে, মহান আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যতে মানুষের চাঁদে পদচিহ্ন রাখার বিষয়ে নিঃসন্দেহে অবগত। কারণ পবিত্র কুরআনে সুরা নিসার ১২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

'যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে, সবকিছু আল্লাহ্রই। আর এ সবকিছুকেই আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।'

সুতরাং, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, সবকিছুই আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে। তাই পৃথিবীতেই হোক, কিংবা মহাকাশে, তিনি অবিরত সকল বস্তু এবং বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ফেরাউনের লাশ কি আদৌ মমি হিসেবে বিবেচনার যোগ্য?

'ফেরাউন' শব্দটি আদৌ কোনো ব্যক্তির নিজস্ব নাম নয়। বস্তুত এটা প্রাচীন মিশরের ঊনবিংশ রাজবংশের শাসকদের একটি উপাধি। এরপর 'মমি' হচ্ছে সাধারণ ভাষায় প্রাচীন মিশরে পচন-নিরোধক বস্তুর সাহায্যে রক্ষিত কবরস্থ মানুষদের (বিশেষভাবে প্রাচীন মিশরীয় শাসকদের) মৃতদেহ। আধুনিক বিজ্ঞানে, আমরা সাইটোপ্লাজম নামক শব্দটির সাথে কমবেশি সবাই পরিচিত। কেননা সাইটোপ্লাজম হলো প্রাণীদেহের কোষগুলোর তরল অংশ। আধুনিক গবেষণা উদঘাটন করেছে, অধিকাংশ প্রাণীদেহ ৫০ থেকে ৯০ ভাগ পানি দ্বারা গঠিত। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেন:

'...আমি প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি...' (সুরা আম্বিয়া: আয়াত-৩০)।

'আর আল্লাহ্ প্রত্যেকটি প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন...' (সুরা নূর: আয়াত-৪৫)।

'আর আল্লাহ্ তিনিই, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে...' (সুরা ফুরকান: আয়াত-৫৪)।

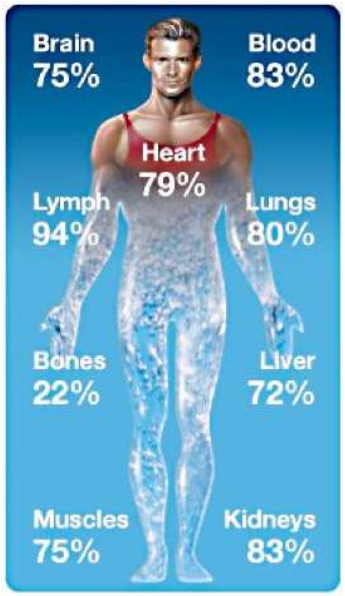

পানি দ্বারা পূর্ণ অখণ্ড মানবদেহ

যখন একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন বিভিন্ন জীবাণু দেহের পানির সাহায্যে সেই মৃত মানুষের চামড়া এবং পেশির কলাগুলো ক্রমশ বিনষ্ট করে ফেলে। এই কারণে, প্রাচীন মিশরে মৃতদেহকে সতেজ রাখার জন্য মমীকরণ পদ্ধতি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মিশরীয়রা বিশ্বাস করত, মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গে চলে যায় এবং দেবতাদের মাঝে জায়গা করে নেয়।

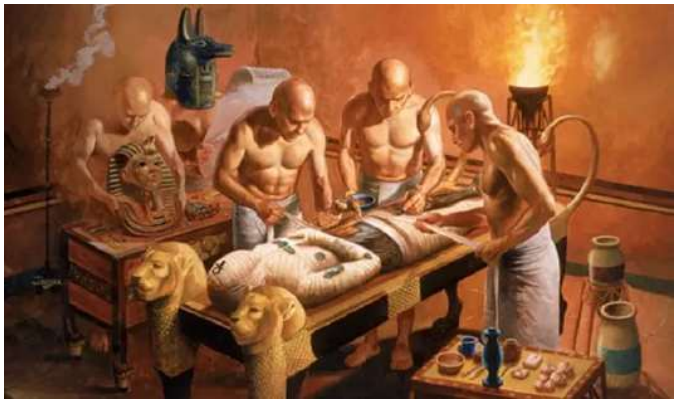

প্রাচীন মিশরের মমীকরণ পদ্ধতি

প্রাচীন মিশরীয় সমাজে, মৃতদেহের মমীকরণ ছিল খুবই জটিল একটি পদ্ধতি। প্রথমে মৃতদেহকে মিশরের বিখ্যাত নীল নদের পানিতে ধৌত করা হতো। তারপর শরীরের বাম অংশ কেটে যকৃত, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র এবং মাথা থেকে মগজ বের করে সযত্নে রেখে দেওয়া হতো চারটি আলাদা পাত্রে, যেগুলোকে বলা হয় ক্যানোপিক জার। শরীরে শুধু বুকের বাম পাশে হৃৎপিণ্ড রেখে দেওয়া হতো, কারণ প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী, এটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তির আসন এবং সেই হৃৎপিণ্ডের ওপর গুবরে-পোকা রেখে দেওয়া হতো, যেটা ছিল জীবন নবায়নের প্রতীক।

চারটি ক্যানোপিক জার

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, শরীরে মূলত ন্যাট্রন জাতীয় উপাদান, মশলা, রজন ইত্যাদি মেশানো হতো এবং মস্তিষ্কের গর্তগুলো কাদা দিয়ে ভরা হতো। তারপর মৃতদেহটিকে রোদে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ দিন শুকানোর পর, লেনিন কাপড় দিয়ে পুরো শরীর পেঁচিয়ে, সাধারণত পিরামিডের ভেতর কবরস্থ করা হতো। সামগ্রিকভাবে, মমীকরণ পদ্ধতি সম্পন্ন করতে সময় লাগে ৭০ দিন, যার পরোক্ষ ইঙ্গিত নবী হজরত মুসা (আ.)-এর ওপর নাজিলকৃত পবিত্র তৌরাত শরিফ থেকে পাওয়া যায়:

'তখন ইউসুফ [নবী ইউসুফ (আ.)] ওনার পিতার মুখের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন এবং ওনাকে চুম্বন করলেন। পরে তিনি ওনার অধীনের ডাক্তারদের হুকুম দিলেন, যেন তারা ওনার পিতার মৃতদেহটি খোশবু-মশলা দ্বারা রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। তারা তাই করল। এই কাজে তাদের ৪০ দিন কেটে গেল। এই কাজে ৪০ দিনই লাগত। মিশরীয়রা ইসরাইলের [নবী ইয়াকুব (আ.)-এর] জন্য ৭০ দিন ধরে শোক প্রকাশ করল।' (পয়দায়েশ ৫০:১-৩)।

ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিসের তিন ধরনের প্রতিকৃতি

এবার পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ফেরাউনের বিষয়ে আসা যাক। অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, দ্বিতীয় রামেসিসই হলো সেই ফেরাউন, যার সাথে নবী হজরত মুসা (আ.) দ্বিন সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শাসক হিসেবে দ্বিতীয় রামেসিস বা রামেসিস দ্য গ্রেট সুখ্যাতি অর্জন করলেও দম্ভ, অহংকার, ঔদ্ধত্য তার কথা ও কাজে সর্বদা প্রকাশ পেত। এমনকি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করে একসময় নিজেকেই ঈশ্বর ঘোষণা করে বসল। এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনে সুরা ত্বাহার ২৪ নম্বর আয়াতে দয়াময় আল্লাহ্ নবী মুসা (আ.) কে নির্দেশ দেন:

‘ফেরাউনের কাছে যাও, সে গুরুতরভাবে সীমা ছাড়িয়ে গেছে।’

তারপর হজরত মুসা (আ.) ফেরাউনের কাছে গেলেন দ্বিনের দাওয়াত দিতে। কিন্তু নবী মুসার শত চেষ্টার পরেও ফেরাউন দ্বিনের পথে একদমই এলো না, বরং সে তার সৈন্যদের নিয়ে মুসা (আ.) এবং তার সাথিদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পিছু ধাওয়া করল লোহিত সাগরের পাড় পর্যন্ত। তখন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে ও মুসা (আ.)-এর লাঠির সাহায্যে সাগর দুই ভাগ হয়ে গেল। তারপর মুসা (আ.) ওনার সঙ্গীদের নিয়ে সাগরের মাঝামাঝি তৈরি হওয়া পথ দিয়ে পার হয়ে গেলেন। ফেরাউন ও তার সৈন্যরা সাগরের সেই পথ অনুসরণ করে যেই মাত্র সাগরের মাঝখানে এসে পড়ল, সাথে সাথে ঢেউয়ের প্রচণ্ড ঝাপটা এসে তাদের নিমজ্জিত করে দিল।

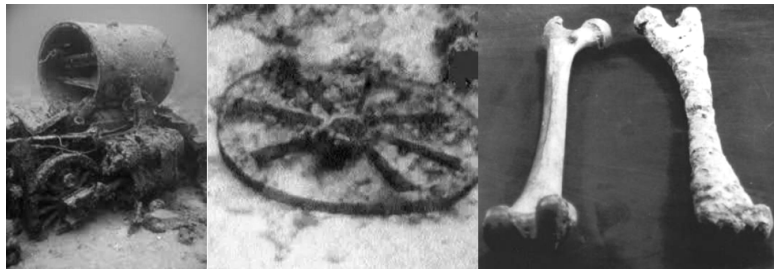

টীকা: রন ওইয়্যাট নামক একজন ব্যক্তি এবং তার ছেলে নুইবা সৈকত থেকে দূরে পানির নিচে পরিভ্রমণ করেন ১৯৭৮ সালে। ঘটনাক্রমে, ওনারা আবিষ্কার করলেন প্রবালে আবৃত রথ, রথের চাকা এবং ঘোড়া ও সৈন্যদের দেহের কিছু হাড়। তারপর সেই সকল সামগ্রী থেকে একটি রথের চাকার সময় নিরূপণ করা হয় এবং জানা যায় সেটা মিশরের ঊনবিংশ রাজবংশীয় সময়কালের। বস্তুত, সেই সময়েরই মিশরের অন্যতম শাসক (ফেরাউন) ছিল দ্বিতীয় রামেসিস।

ফেরাউনের মৃতদেহটি বর্তমান মিশরের কায়রোতে অবস্থিত জাদুঘরের ‘রয়াল মমিজ’ নামক একটি কক্ষে সংরক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেট কর্তৃক ১৮৯৮ সালে এটি আবিষ্কৃত হয় এবং মৃতদেহটি দ্বিতীয় রামেসিসের বলে শনাক্ত করা হয়।

ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিসের মৃতদেহ

পবিত্র কুরআনে সুরা ইউনুসের ৯২ নম্বর আয়াতে, ফেরাউন বা দ্বিতীয় রামেসিসের মৃতদেহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন:

‘আজ আমি কেবল তোমার মৃতদেহকেই রক্ষা করব, যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে থাকো...’

এই উল্লেখিত আয়াতে, ফেরাউনের লাশটিকে আল্লাহ্ পাক আদৌ মমি হিসেবে সম্বোধন করেননি, কারণ তার লাশটি কোনোভাবেই প্রাচীন মিশরীয় পদ্ধতিতে মমীকরণ হয়নি। তাই সব শেষে বলা যায়, ফেরাউন বা দ্বিতীয় রামেসিসের লাশটি কিছুতেই মমি বলা যায় না, বরং তার লাশটিকে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক রক্ষিত একটি অভিশপ্ত শব হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

পবিত্র কুরআন ইংরেজি ভাষায় নাজিল হলে কি ভালো হত না?

ইংরেজি নিঃসন্দেহে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। যদিও আরো কিছু আন্তর্জাতিক ভাষা আছে, যেমন: আরবি, জার্মান, ফরাসি, চাইনিজ, স্প্যানিশ ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর মধ্যে ইংরেজির ব্যবহার বিশ্বের সর্বত্র দেখা যায়। এ কারণেই ইংরেজিকে একপ্রকার শীর্ষস্থানীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আজকাল ইংরেজি শুধু ইংল্যান্ড বা আমেরিকার ভাষাই নয়, বরং বিশ্বের অনেক দেশ ইংরেজিকে তাদের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করেছে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ইংরেজির মাধ্যমে এক দেশের সাথে আরেক দেশের যোগাযোগ রক্ষা করে। শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য, গণমাধ্যমসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সংগত কারণেই অনেকেই প্রশ্ন তোলেন যে, মহান আল্লাহ্ তাআলা যদি মহাবিবেচক ও মহাজ্ঞানী হয়েই থাকেন, তবে তিনি কোনো পবিত্র কুরআন ইংরেজির পরিবর্তে আরবি ভাষায় নাজিল করলেন? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হলে, ভাষাবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে আমাকে আশ্রয় নিতে হবে ভাষার ইতিহাসের কাছে।

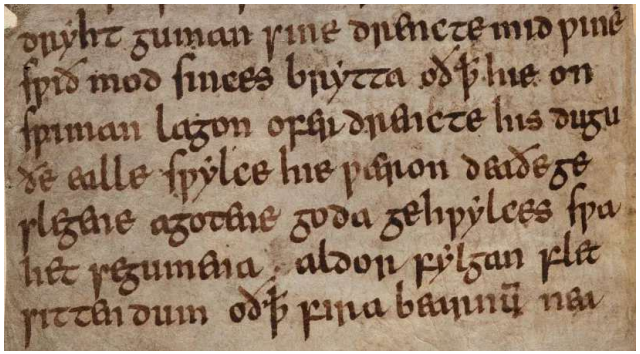

দুর্বোধ্য পুরাতন ইংরেজি ভাষার একটি নমুনা

উৎপত্তি ও ভৌগোলিক বিচারে আরবি ভাষাকে সেমিটিক বা আফ্রো-এশিয়াটিক উপভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া ধারণা করা হয়, সেমিটিক শব্দটি পবিত্র বাইবেলে

বর্ণিত নবী নোয়া [নুহ (আ.)]-এর পুত্রের নাম সাম বা স্যাম থেকে এসেছে। বস্তুত, এই সাম বা স্যামকে সেমিটিক জাতির জনক হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। প্রাচীন ভাষাভিত্তিক বংশধারা অনুসারে আরবি, হিব্রু, আরামিক, ইথিওপিক, ফিনিশীয়, এবং আক্কাডিয়ান উপভাষাগুলোকে সাধারণত সেমিটিক ভাষার দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেমিটিক ভাষার দলে আরবি হলো সবচেয়ে কনিষ্ঠ উপভাষা। বর্তমান বিশ্বে আরবি একটি স্বতন্ত্র ভাষা হলেও, আরবি বর্ণমালার ধ্বনিসমূহে প্রাচীন হিব্রু বর্ণমালার ব্যাপক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া আরবি এবং হিব্রু ভাষাকে বিভিন্ন নথিতে ফিনিশীয় ভাষার বংশধর হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

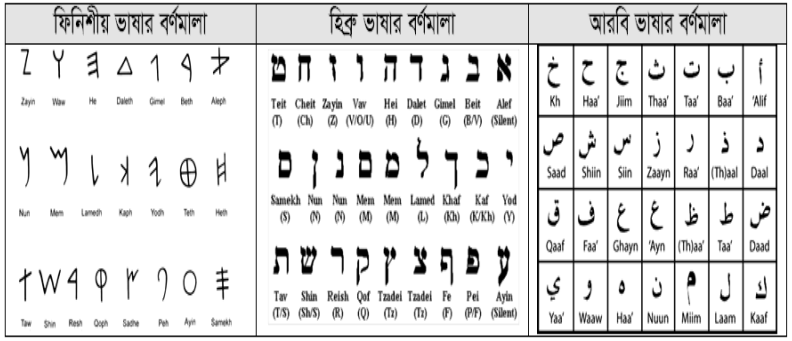

পবিত্র কুরআনে সুরা ইবরাহিমের ৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেছেন:

'আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি...'

উক্ত আয়াতটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি, মহান আল্লাহ্ সকল নবী-রাসুলকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় নিজ নিজ গোত্রের নিকট প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আমরা জানি, বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ভাষা ছিল আরবি, এবং ওনার ওপর নাজিলকৃত কুরআনের ভাষাও আরবি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পবিত্র কুরআন যদি সর্বজনীনভাবে সকল মানবজাতির জন্য নাজিল হয়, তবে সেটা কোনো আরবি ভাষায়? ইংরেজি ভাষায় কোনো নয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে সুরা হামীম-আস-সাজদার ৪৪ নম্বর আয়াতে বলেন:

'আমি যদি অনারব ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম, তবে ওরা অবশ্যই বলত: এর আয়াতগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল না কেন? এ কেমন কথা, অনারবি কিতাব এবং আরবিভাষী রাসুল! [মহানবী (সা.)]...'

সুতরাং, আল্লাহ্ যদি আরবিভাষী রাসুল (সা.)-এর ওপর যদি ইংরেজি ভাষায় কুরআন নাজিল করতেন তাহলে ব্যাপারটা অবিসংবাদিতরূপে হাস্যকর হিসেবে প্রতীয়মান হতো। এখন অনেকে আবার প্রশ্ন তুলতে পারেন যে আল্লাহ্ কোনো রাসুল (সা.)-কে ইংরেজিভাষী নবী হিসেবে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করলেন না? এখন আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেব ইংরেজি ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আলোকে।

পঞ্চম শতাব্দীতে, ব্রিটেন যখন জার্মানির তিনটি গোত্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, বস্তুত তখন থেকেই ইংরেজি ভাষার ইতিহাসের সূচনা হয়। এই তিনটি গোত্র হচ্ছে অ্যাংগল, স্যাকসন ও যুট। সেই সময় ব্রিটেনের লোকজন কেলটিক ভাষায় কথা বলত। জার্মানির এই আক্রমণকারীরা অধিকাংশ কেলটিক ভাষাভাষী লোকজনদের ব্রিটেন থেকে তাড়িয়ে দেয়, ফলে সেই লোকজনরা বর্তমান ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে আশ্রয় নেয়। অ্যাংগল নামক গোত্রের নামটি এসেছে ইংলাল্যান্ড নামক শব্দ থেকে এবং তাদের ভাষা ছিল ইংলিস্ক। কার্যত এই ইংলিস্ক শব্দটি থেকেই ইংল্যান্ড ও ইংলিশ (ইংরেজি)-এর উৎপত্তি।

৪৫০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় পুরাতন ইংরেজির অধ্যায়। আক্রমণকারী এই জার্মানির গোত্রগুলো যে ভাষায় কথা বলত, সেটাই বর্তমানে আমরা পুরাতন ইংরেজি হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকি। এই পুরাতন ইংরেজি ভাষাটিকে বোধগম্য করা আজকের খাঁটি ইংরেজি ভাষাভাষী লোকজনদের পক্ষেও বেশ দুরূহ।

পুরাতন ইংরেজি শব্দ	আজকের ইংরেজি শব্দ	পুরাতন ইংরেজি শব্দ	আজকের ইংরেজি শব্দ
art	are	dost	do /does
beseech	request	durst	dare
besought	made request	fere	friend

betwixt	between	hath	has
cometh	comes/coming.	hither	here
nary	none	onuppan	above
naught	nothing	shalt	shall
thou	you	thy	your
thee	You (object)	thine	your
ye	you	thither	there
yore	years ago.	wilt	will
wit	To know	wist	knew
wilt	will	whence	from where

১১০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় মধ্যযুগীয় ইংরেজির অধ্যায়। ১০৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, বর্তমান ফ্রান্সের নরম্যান্ডি নামক স্থানের বীর ডিউক উইলিয়াম ইংল্যান্ড জয় করেন। এর ফলে এই বিজয়ী নরমানরা রাজকীয় দরবার, ব্যবসায়ী এবং শাসক শ্রেণির লোকজনদের মধ্যে ফরাসি ভাষা চালু করেন। এতে ভাষাসংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ শ্রেণি বিভাজন দেখা দেয়। সেই সময়, নিচু শ্রেণির লোকেরা ইংরেজি এবং অভিজাত শ্রেণির লোকেরা ফরাসি ভাষায় কথা বলত। এরপর চতুর্দশ শতাব্দীতে, ইংরেজি ভাষা পুনরায় তার আধিপত্য ফিরে পায়, কিন্তু বিপুল পরিমাণ ফরাসি শব্দ ইংরেজি ভাষাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। নিচে ফরাসি শব্দমালার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো, যেগুলো ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করেছে:

প্রশাসনিক	govern, government, administer, crown, state, empire, royal, majesty, treaty, statute, parliament, tax, rebel, traitor, treason, exile, chancellor, treasurer, major, noble, peer, prince, princess, duke, squire, peasant, slave, servant, vassal.
ধর্মীয়	religion, theology, sermon, confession, clergy, clergy, cardinal, friar, crucifix, miter, censer lectern, abbey, convent, creator, savior, virgin, faith, heresy, schism, solemn, divine, devout, preach, pray, adore, confess.

আইন	justice, equity, plaintiff, judge, advocate, attorney, petition, inquest, felon, evidence, sue, accuse arrest, blame, libel, slander, felony, adultery, property, estate, heir, executor.
সামরিক	army, navy, peace, enemy, arms, battle, spy, combat, siege, defence, ambush, soldier, guard, mail, buckler, banner, lance, besiege, defend, array.
পরিচ্ছদ	habit, gown, robe, garment, attire, cape, coat, collar, petticoat, train, lace, embroidery, pleat, buckle, button, tassel, plume, satin, taffeta, fur, sable, blue, brown, vermilion, russet, tawny, jewel, ornament, broach, ivory, turquoise, topaz, garnet, ruby, pearl, diamond.
খাবার	feast, repast, collation, mess, appetite, tart, sole, perch, sturgeon, sardine, venison, beef, veal, mutton, port, bacon, toast, cream, sugar, salad, raisin, jelly, spice, clove, thyme.
শিক্ষা ও কলা	painting, sculpture, music, beauty, color, image, cathedral, palace, mansion, chamber, ceiling, porch, column, poet, prose, romance, paper, pen, volume, chapter, study, logic, geometry, grammar, noun, gender.
চিকিৎসাবিদ্যা	physician, malady, pain, gout, plague, pulse, remedy, poison.
সামাজিক	curtain, couch, lamp, wardrobe, screen, closet, leisure, dance, carol, lute, melody, rein, curry, trot, stable, harness, mastiff, spaniel, stallion, pheasant, quail, heron, joust, tournament, pavilion.
বাক্যাংশ	draw near, make believe, hand to hand, by heart, without fail.

১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় আধুনিক ইংরেজির প্রারম্ভিক অধ্যায়। এই অধ্যায়ে ইংরেজি ভাষায় স্বরধ্বনির অসামান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও ষোড়শ শতাব্দী থেকে ব্রিটিশরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের লোকজনদের সাথে যোগাযোগে সক্ষম হয়।

স্বরধ্বনির অসামান্য পরিবর্তন				
১৫০০	**১৬০০**	**১৭০০**	**১৮০০**	**বর্তমান**
/ei/	/ɛi/	/ʌi/	/ai/	
/ou/	/ɔu/	/ʌu/	/au/	
/i:/				
/u:/				
		/e:/	/i:/	
		/o:/		/əu/
/æ:/	/ɛ:/	/e:/		
/æi/	/ɛi/	/e:/		
/ɒu/	/ɒ:/			/ɔ:/

১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে, বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় আধুনিক ইংরেজির অধ্যায়। আধুনিক ইংরেজির প্রারম্ভিক অধ্যায়ের সাথে বর্তমান ইংরেজির প্রধান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রে। কারণ ইংল্যান্ডের উৎপাদনশিল্প-সংক্রান্ত বিপ্লব ও প্রযুক্তিবিদ্যা নতুন নতুন শব্দভাণ্ডার সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। তা ছাড়াও, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশদের উপনিবেশ স্থাপনের ফলে, অনেক বিদেশি শব্দ আধুনিক ইংরেজিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের উপনিবেশ স্থাপনের ফলে আমাদের নিজস্ব বেশ কিছু পরিচিত শব্দ ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করেছে, যেগুলো নিচে প্রদত্ত হল:

পণ্ডিত = Pundit	বারান্দা = Verandah
রাজা = Raja	ব্রাহ্মণ = Brahman

রানি = Rani	কুলি = Coolie
সিপাই = Sepoy	জঙ্গল = Jungle
বাংলা = Bengal	লুট = Loot

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে, আমরা ইংরেজি এবং আরবি ভাষার ইতিহাসসিদ্ধ উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরা প্রায় সকলেই জানি, ৬১০ বা ৬১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা আরবিভাষী রাসুল (সা.)-এর ওপর পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল করেছিলেন। বস্তুত পবিত্র কুরআন যখন নাজিল হয় তখন আরবি পৃথিবীর বুকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাষা নিঃসন্দেহে পরিবর্তনশীল, তার পরও পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত সেই পুরাতন শব্দসম্ভারের প্রায় সিংহভাগ শব্দ আজও আধুনিক আরবিতে ব্যবহার করা হয়, যেটা ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে আদৌ হয় না। আধুনিক পৃথিবীর বুকে, ইংরেজি একটি স্বতন্ত্র ভাষা হলেও, এই ভাষাটির প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন শুরু হয় ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পরে, যে সময়ে রাসুল (সা.) আদৌ জীবিত ছিলেন না। এমনকি, আধুনিক ইংরেজির অতি সহজ ও সাধারণ অভিব্যক্তিগুলোও আজকাল বিচিত্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে অবিরত ইংরেজি অভিধানগুলোকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছে:

প্রকৃত অভিব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি
A lot of	A lotta
Lots of	Lotsa
Because	Cause/Cos
Did you	Didja
Could you	Couldja
Don’t know	Dunno
Don’t you	Doncha
Got you	Gotcha
What are you?	Watcha
Where did you?	Whadja

Going to	Gonna
Got to/Have got to	Gotta
Have to	Hafta
Has to	Hasta
Had to	Hadda
Kind of	Kinda
Used to	Useta
Let me	Lemme
Must have	Musta
Might have	Mighta
Ought to	Oughta/Odda/Otta
Should have	Shoulda
Want to	Wanna
Give me	Gimme
Them	Em
Will you	Wilya
Cup of	Cuppa
Sort of	Sorta
Out of	Outta

আমাদের দেশের কিছু মানুষ ইংরেজিকে ইবলিসের ভাষা হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন, যদিও কথাটি একদমই ঠিক নয়। কেননা পৃথিবীর সকল ভাষার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ তাআলা চাইলে যেকোনো ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতে পারতেন। তাই আমি এটুকুই বলতে পারি, আল্লাহ্ তাআলা মহাজ্ঞানী ও মহাবিবেচক বলেই, তিনি আমাদের পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন, যা যেকোনো ভাষায় অনুবাদযোগ্য। সব শেষে পবিত্র কুরআনে সুরা যুমারের ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই বলেছেন, ‘এ কুরআন আরবি ভাষায়, এতে বিন্দুমাত্রও জটিলতা নেই, যেন মানুষ সাবধান হয়।’

বোরাক কি আদৌ ঐশ্বরিক মহাকাশযান?

'বোরাক' শব্দটির সাথে মুসলমানরা কমবেশি সবাই পরিচিত। বোরাক হচ্ছে সেই জন্তু বা বাহন, যেটাতে চড়ে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) মহান অল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, যা 'মিরাজ' অথবা 'রজনীর ভ্রমণ' হিসেবে পরিচিত। যদিও, অনেক ব্যক্তির কাছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মিরাজ একটি বিতর্কিত বিষয় বোরাক নামক বাহনের কারণে। বোরাক আল্লাহ্র প্রেরিত এমন একটি বাহন, যেটার ডানা ছিল এবং উড়তে পারত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করার পর, বায়ুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। ফলে বোরাকের পক্ষে নিজ ডানার ওপর নির্ভর করে শূন্যে ওড়া কখনো সম্ভব নয়।

এবার আধুনিক মহাকাশযানের বিষয়ে আসা যাক। বস্তুত মহাকাশযানের বোরাকের মতো ডানা নেই, তবু সেটা ঊর্ধে গমন করতে সক্ষম। একটি মহাকাশযানের ঊর্ধ্বে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন, যা মহাকাশযানের অভ্যন্তরে মজুদ থাকে। তারপর সেই জ্বালানির মাধ্যমে মহাকাশযানটি গতিশক্তির সৃষ্টি করে এবং একটা সময় বায়ুমণ্ডলের স্তর অতিক্রম করে সাধারণত চাঁদ কিংবা মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে গমন করে। এ থেকে বোঝা যায়, একটি মহাকাশযান, তার প্রয়োজনীয় গতিশক্তি ভূপৃষ্ঠেই উৎপাদন করে থাকে, কারণ শুধু ভূপৃষ্ঠেই বায়ু এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বায়ুমণ্ডলের স্তর অতিক্রম করার পর, একটি মহকাশযানের পক্ষে গতিশক্তি উৎপাদন করা আদৌ সম্ভব নয়।

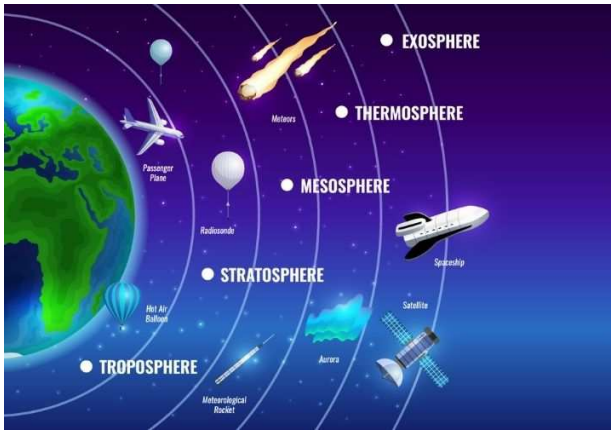

বায়ুমণ্ডলের বিবিধ স্তর

এখন বোরাকের বিষয়ে আবার আসা যাক। পবিত্র কুরআনে বোরাক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা নেই। তারপরও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা বেরাককে বিশ্লেষণ করা যাক। ***আমি কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না*** নামক গ্রন্থের ১০৫ নম্বর পৃষ্ঠায় জনাব প্রবীর ঘোষ উল্লেখ করেছেন, 'বোরাক-এর দেহ ঘোড়ার, মাথা সুন্দরী যুবতির, পিঠে পাখির ডানা। বোরাকের পাখা ছিল। বোরাক উড়তে পারত।'

বিভিন্ন ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মে 'বোরাক' যে রূপে উপস্থাপিত হয়

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময় বোরাকের গন্তব্যস্থল আসলে কী ছিল?

ভূপৃষ্ঠ থেকে আসমানে শেষ সীমার কূলবৃক্ষ (সিদরাতুল মুনতাহা), নাকি সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশ?

কার্যত, বোরাকের গন্তব্যস্থল যদি সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশ হত, তবেই বোরাক তার ডানার সাহায্যে উড়োজাহাজ কিংবা পাখির ন্যায় ওড়ার প্রশ্ন আসত। কারণ একটি উড়োজাহাজ কিংবা পাখি বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর মাঝেই ওড়ার ক্ষমতা রাখে।সত্যি বলতে, বোরাক নিজেও সেই ক্ষমতা রাখে। কারণ বোরাক তার পিঠে মহানবী (সা.)-কে চড়িয়ে নিজ ডানাদ্বয়ে ভর করে, বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর মাঝে অবস্থান করেই, জেরুসালেমের মসজিদুল আকসায় গিয়েছিল। কিন্তু জেরুসালেম থেকে সিদরাতুল মুনতাহায় যাওয়ার ক্ষেত্রে, বোরাক আদৌ ওড়েনি, যার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিচের উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায়:

'এ জন্তুটি বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন বলেই এটিকে বোরাক নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, 'বোরাক' শব্দটির মূল হচ্ছে বারকুন, যার অর্থ বিদ্যুৎ। এ জীবটি এক লাফেই দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করতে পারত।' {***কাসাসুল আম্বিয়া***, পৃষ্ঠা নম্বর-৫৬৮, এবং ***বোখারি শরিফ*** (***প্রকাশক:*** *সোলেমানিয়া বুক হাউস*), অধ্যায়-৪৫, হাদিস নম্বর-১৩০১}।

উপরের এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, 'বোরাক' নামক জীবটি আসলে বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন। তথাপি, বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, যখন বস্তুর গতি বৃদ্ধি পায়, তখন এর সময় তত ধীরে অতিবাহিত হয়। অধিকন্তু 'বোরাক' এক লাফে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করতে পারে, যেটা কখনো তার ডানার দ্বারা সম্ভব নয়। বরং সেটা বোরাকের চারটি পা দ্বারাই সম্ভব। কার্যত বোরাক বায়ুমণ্ডলের মাঝে অবস্থান করে, তার পাগুলোকে ভূমির ওপর দাঁড়িয়েই তার ডানাদ্বয়ের মাধ্যমে গতিশক্তি প্রদান করে। ঠিক যেভাবে, একটি রকেট তার নিজস্ব জ্বালানি দ্বারা গতিশক্তি উৎপাদন করে থাকে। সুতরাং বোরাক এবং রকেট উভয়ই বায়ুমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করে নিজস্ব গন্তব্যস্থলে যেতে সক্ষম।

রকেট চলে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুসারে

সত্যি বলতে, উপরোক্ত আলোচনা আমাদের স্যার আইজ্যাক নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র হল: 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে।' সব শেষে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের ওপর নির্ভর করে বলা যায়, বোরাক নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন ঐশ্বরিক মহাকাশযান।

পবিত্র কুরআন প্রাচীন মিশরীয় সকল শাসককে কোনো ফেরাউন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না?

প্রাচীন মিশরে একসময় ৪০টি ছোট ছোট রাজ্য ছিল এবং সেই সকল রাজ্যের শাসকরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। বিজয়ী শাসক সর্বদা পরাজিত শাসকের রাজ্য দখল করে নিজ রাজ্যের আওতায় নিয়ে নিত। এ ধরনের শাসকদেরই একজন মিশরের সমগ্র উত্তরাঞ্চল (যেটুকু নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চল) দখল করে নেয়। অপরদিকে অন্য আরকজন শাসক সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে নীল নদের বিস্তীর্ণ উপত্যকা ধীরে ধীরে জয় করে নেয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে, দক্ষিণাঞ্চলের শাসক উত্তরাঞ্চলীয় শাসকের রাজ্য জয় করে নেয়। এভাবেই, সমগ্র মিশর একটি বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে একজন শাসকের অধীনে শাসিত হতে থাকে। চিরাচরিত রীতি অনুসারে, প্রাচীন মিশরীয় শাসককে ফেরাউন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও সেটা আদৌ সঠিক নয়। জানা যায়, 'ফেরাউন' নামক আখ্যাটি মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের মাঝামাঝি সময় থেকে চালু হয়েছে।

যাই হোক, মেনেস (নার্মার) ছিল গোটা মিশরের সর্বপ্রথম শাসক (যে ফেরাউন আখ্যাধারী নয়)। শাসক হিসেবে মেনেস ছিল অত্যন্ত কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। সে নিজ রাজ্যকে নীল নদের প্রপাত এলাকা থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। তখন এই রাজ্যের রাজধানী হয় মেম্ফিস। যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা, সকল প্রাচীন মিশরীয় শাসক পরিবারগুলোর মধ্যে সর্বশেষ রাজবংশ ছিল গ্রিকদের প্রতিষ্ঠিত টেলেমি রাজবংশ এবং যার সর্বশেষ শাসক ছিল রানি সপ্তম ক্লিওপেট্রা। কার্যত এই সপ্তম ক্লিওপেট্রাই তার সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এবং যাকে একসময় রোমের সম্রাট জুলিয়াস সিজার এবং মার্ক অ্যান্টনি উভয়ই প্রেম নিবেদন করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩০ অব্দে, একটিয়ামের যুদ্ধে তৎকালীন রোমের সম্রাট অগাস্টাস সিজারের নিকট অ্যান্টনির শোচনীয় পরাজয় ঘটলে, রানি সপ্তম ক্লিওপেট্রার শাসনের অবসান ঘটে।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রধান দুটি ধর্মগ্রন্থের প্রথা অনুযায়ী, নবী হজরত ইবরাহিম

(আ.), ইউসুফ (আ.) ও মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক সময়গুলোতে মিশরীয় শাসকদের কখনো কখনো ফেরাউন, আবার কখনো কখনো মালিক হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল অনুসারে, হজরত ইবরাহিম (আ.), ইউসুফ (আ.) এবং মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক মিশরীয় শাসকদের সর্বদা ফেরাউন হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে।

রানি সপ্তম ক্লিওপেট্রা

অপরদিকে, পবিত্র কুরআনে নবী হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর সময়ের মিশরীয় শাসকদের 'আখ্যা' নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি। তবে নবী মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক মিশরীয় শাসককে 'ফেরাউন' এবং 'ইউসুফ' (আ.)-এর সমসাময়িক মিশরীয় শাসককে 'মালিক' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর যৌক্তিক কারণগুলো ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধেই আমি বর্ণনা করব।

অনেক ইতিহাসবেত্তাদের মতে, নবী হজরত মুসা (আ.)-এর আয়ুষ্কাল ছিল ১২০ বছর এবং ওনার জীবনের অনেকাংশ সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অতিক্রান্ত করেছেন। এ ছাড়া খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ অব্দে তিনি মিশরেই অবস্থান করেছিলেন, ঠিক যে সময় মিশরের শাসক ছিল দ্বিতীয় রামেসিস। কার্যত, দ্বিতীয় রামেসিসের শাসনকাল ছিল ঊনবিংশ রাজবংশের খ্রিস্টপূর্ব ১২৭৯ থেকে ১২১৩ অব্দ পর্যন্ত। অধিকন্তু *The Universal Jewish Encyclopedia* বর্ণনা করে যে, খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর তিন অথবা চার চতুর্থাংশ

সময়ে, মওযেয (মুসা) স্পষ্টরূপে জীবিত ছিলেন এবং যথাযোগ্যভাবে দ্বিতীয় রামেসিস ছিল ইতিহাসের কুখ্যাত ফেরাউন।

ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিস

বস্তুত, দ্বিতীয় রামেসিস ছিল স্বাভাবিকভাবেই একজন ফেরাউন, তাই পবিত্র কুরআনে তাকে ফেরাউন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন মিশরীয় চিত্রাক্ষর (Hieroglyph) অনুসারে 'ফেরাউন' অর্থ বিশাল বাড়ি। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআন থেকে নেওয়া, সুরা আরাফের ১০৪ নম্বর আয়াতে আরবিতে লিখিত 'ফেরাউন' শব্দটি নিম্নে আন্ডারলাইন করা হল:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا
ٱلْحَقَّ ۖ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ
بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ

অনুবাদ: 'মুসা বলল: হে ফেরাউন! বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমি একজন রাসুল।'

এবার 'মালিক' নামক সম্বোধন বা উপাধির প্রসঙ্গে আসা যাক। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৮৬ থেকে ১৫৭০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালটি ছিল মিশরীয় শাসকদের শাসনামলের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী সময়কাল। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দে, সেমিটিক জাতি মিশরীয়দের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে মিশরে ঢুকে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এশিয়া থেকে আগত এই সেমিটিকদের 'হাইকসোস' বলা হয়। 'হাইকসোস' শব্দটি মিশরীয় শব্দ হেকা ও খাসিওয়েট শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যার অর্থ দাঁড়ায় 'বিদেশি ভূমির শাসকগণ'। এই হাইকসোসরা সেই সময়ের মিশরীয় শাসকদের যুদ্ধে পরাজিত করে, নীল বদ্বীপ ও সেখানকার অপূর্ব শহর এবং দালানগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ফলস্বরূপ, মিশরের বিবিধ অঞ্চলের পরাজিত সেই শাসকরা সিংহাসনে বসার অনুমতি পেলেও, তাদের ক্ষমতা সীমিত করে দেওয়া হয়। সালিটিস, খাইয়ান, প্রথম এপোপি প্রমুখ ছিল প্রচীন মিশরের উল্লেখযোগ্য হাইকসোস শাসক।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, নবী হজরত ইউসুফ (আ.) মিশরে প্রবেশ করেন খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭৪ থেকে ১৫৫৩ অব্দের সময়কালে, ঠিক যে সময়ে হাইকসোসরা সমগ্র মিশরের প্রজাপালক হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন। পরবর্তী সময়ে, জন্মসূত্রে একজন খাঁটি মিশরীয় ব্যক্তি প্রথম আহমোস খ্রিস্টপূর্ব ১৫৭০ অব্দে, মিশরের স্থানীয় সিংহাসনে বসেন এবং পূর্বপুরুষদের হারানো শক্তি ফিরে পেতে তিনি অসংখ্য উৎসাহী লোকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ অব্দে, নীল বদ্বীপে হাইকসোসদের ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে নতুন রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যেটা ছিল মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশ। এ কারণেই, পবিত্র কুরআনে হজরত ইউসুফ (আ.)-এর সময়কালের মিশরীয় শাসককে 'ফেরাউন' হিসেবে সম্বোধন করার পরিবর্তে 'মালিক' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, 'ফেরাউন' নামক আখ্যাটি মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের মাঝামাঝি সময় থেকে চালু হয়েছে। অষ্টাদশ রাজবংশের সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫০ থেকে ১২৯২ অব্দ পর্যন্ত। যাই হোক, আরবিতে 'মালিক' শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলো 'বাদশাহ'। তা ছাড়াও পবিত্র কুরআন থেকে নেওয়া, সুরা ইউসুফের ৪৩ নম্বর আয়াতে আরবিতে লিখিত 'মালিক' শব্দটি নিম্নে আন্ডারলাইন করা হল:

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ
يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا
تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ وَمَا نَحْنُ

অনুবাদঃ 'আর মালিক (বাদশাহ) বলল: আমি তো স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটাতাজা গাভি, এদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভি; এবং দেখেছি সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ। হে পরিষদবর্গ! আমার এ স্বপ্ন সম্পর্কে আমাকে ব্যাখ্যা দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে সক্ষম হও।'

প্রথম আহমোস

পরিশেষে বলা যায়, এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য-প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সহজেই বলা যায়, সমগ্র মহাবিশ্বের মহান সুবিবেচক আল্লাহ্‌র লিখিত পবিত্র কুরআন সকল প্রাচীন মিশরীয় শাসকদের 'ফেরাউন' উপাধিতে স্বীকৃতি কোনোভাবেই দিতে পারে না।

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বসমূহের আলোকে কেমন হবে প্রচলিত ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর বিবিধ সৃষ্টিতত্ত্ব?

'পৌরাণিক' শব্দটি বিশেষণ পদ হিসেবে সরাসরি পুরাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ ভাষায়, 'পুরাণ' (Myth) হল ইতিহাস, আখ্যান-উপাখ্যান, ধর্মীয় বিধি-বিধান ইত্যাদি সংবলিত এক শ্রেণির মিশ্র সাহিত্য। অতি প্রাচীন কোনো জনগোষ্ঠীর অজানা জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে হলে, আগে জানতে হবে তাদের পুরাণকে। কোনো জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে হলে সেটাকে দেখতে হবে তাদের চোখেই, অর্থাৎ পুরাণের মধ্য দিয়ে। মানুষের আচরণ তাদের জীবনের গাঠনিক সত্যতার চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়, তাদের বিশ্বাসের অলীকত্ব দ্বারা। কার্যত পুরাণ কথিতরূপে বাস্তবে পরিণত হতে পারে, যদি মানুষ সেটাকে যথেষ্ট আবেগ দিয়ে বিশ্বাস করে। কেননা ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে, পুরাণ হয়ে ওঠে অতীতের বিশেষ সংস্করণ, যা ব্যাখ্যা করে বর্তমানকে এবং আধুনিক মানুষের চেতনাকে বিভিন্নভাবে ছাঁচ প্রদান করে সামাজিক, ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কোনো সন্দেহ নেই যে, পুরাণের রয়েছে অফুরন্ত শক্তি। তাই আমার এই প্রবন্ধে, বিস্মৃত পুরাণগুলোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি একটু ভিন্ন অবয়বে।

(১)

প্রাচীন সুমেরীয় পুরাণ অনুযায়ী, পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ ডুবে ছিল সমুদ্রে এবং ভয়ংকর একটি দৈত্য তখন পানি থেকে মাটিকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে বাধা দিত। অধিকন্তু **পেরুর প্রাচীন ইনকা পুরাণ** অনুসারে, কালের সূত্রপাতে সবকিছু ডুবে ছিল অন্ধকারে, কেননা তখনো সৃষ্টি হয়নি সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্ররাজি। এই আদি অন্ধকারের মাঝে জন্ম নিলেন স্রষ্টা 'ভিরাকোচা', যার নামের অর্থ সমুদ্র সফেন। এ ছাড়াও, পবিত্র তৌরাত শরিফে উল্লেখ আছে:

'শুরুতে আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। দুনিয়া আকারবিহীন ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার পানির ওপর অবস্থান করছিল, আর আল্লাহ্‌র রুহ্ পানির উপরে বিচরণ

করছিল।' (পয়দায়েশ ১:১-২)।

এবং পবিত্র কুরআন শরিফে উল্লেখ আছে:

'আর তিনিই (আল্লাহ্) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন ওনার (আল্লাহ্‌র) আরশ পানির ওপরে ছিল...' (সুরা হুদ, আয়াত-৭)।

তাই ইনকা পুরাণে, 'সমুদ্র সফেনের জন্ম' পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে তৌরাত শরিফের 'আল্লাহ্‌র রুহ্-এর পানির উপরে বিচরণ', এবং পবিত্র কুরআনের 'ওনার (আল্লাহর) আরশ পানির ওপরে'। 'সমুদ্র সফেন' শব্দটির অর্থ সমুদ্রের ফেনা যা বুদবুদ সৃষ্টি করে থাকে।

ইনকা পুরাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি

এই বুদবুদতত্ত্বের (Bubble Theory) ওপর ভিত্তি করে, ডা. এন. সি. বোস ওনার ***কোরআন বাইবেল বেদ ও বিজ্ঞান*** নামক বইয়ে ৭৮, ৯৩, ও ১৪১ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: 'এখানে ব্রহ্মাজী বলিয়াছেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাহার অংশাবতার মহাবিষ্ণুরূপে কারণ-সমুদ্রে যোগনিদ্রায় শায়িত এবং তাহার দিব্য

শরীরের লোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বুদবুদ আকারে প্রকাশিত হইতেছে।' (ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/৪৭)।

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ-সমুদ্রে মহাবিষ্ণুর শরীর হতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বুদবুদ আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময়, বুদবুদগুলো হাজার হাজার বছর ধরে কারণ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে। পরে যখন প্রতিটি বুদবুদের মধ্যে গর্ভোদক শক্তি প্রবেশ করে, তখন ব্রহ্মাণ্ডগুলো কার্যশীল হয়। বিজ্ঞানী অ্যালান গুথ মনে করেন, বুদবুদগুলো একে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে একটি বুদবুদে পরিণত হয়, যেখান থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র তৌরাত শরিফের উল্লেখ আছে:

"তারপর আল্লাহ্ বললেন, 'পানির মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি হোক, আর তাতে পানি দুই ভাগ হয়ে যাক'। এভাবে আল্লাহ্ পানির মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করলেন, এবং নিচের পানি ও উপরের পানি আলাদা করলেন। তাতে উপরের পানি ও নিচের পানি আলাদা হয়ে গেল। আল্লাহ্ যে ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করেছিলেন, তার নাম দিলেন আকাশ...।" (পয়দায়েশ ১:৬-৮)।

প্রচীন মিশরীয় পুরাণে সুনির্দিষ্ট একটি বিশ্বজগৎ বিকশিত হওয়ার পূর্বে অন্ধকারে বিরাজ করত, স্থির জলরাশির এক অসীম সমুদ্র, যা ধারণা করা হতো 'নু' নামক আদিসত্তা রূপে। 'নু'-এর প্রকৃতি সৃষ্টিপূর্ব অনস্তিত্বকে প্রতীকায়িত করে। কার্যত প্রাণহীন জলরাশির এই বিশাল ব্যাপ্তি কখনো হারিয়ে যায়নি, এবং সৃষ্টির পরবর্তী সময়ে কল্পনা করা হলো যে, এটি সূর্য, নক্ষত্ররাজি, পৃথিবী এবং স্বর্গীয় আকাশকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।

মিশরীয় পুরাণে আদিসত্তা 'নু'

কার্যত অ্যালান গুথ ধারণা করেন, মহাবিশ্ব এত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল যে, জলরাশির বুদবুদগুলো আলোর গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে, এরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এর ফলে বুদবুদগুলো যুক্ত হতে সক্ষম হয় না, এবং প্রতিটি বুদবুদের মধ্যে একটি করে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় বিগব্যাং বা বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি বুদবুদে ব্রহ্মাণ্ড হিসেবে সৃষ্টি হয় নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি।

অধিকন্তু, ডা. এন. সি. বোস ওনার ***কোরআন বাইবেল বেদ ও বিজ্ঞান*** নামক বইয়ে ৯৬ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন:

'...আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, কাল হইতেছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি, প্রকৃতির সাম্য, অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, যাহার থেকে সৃষ্টির শুরু হয়।' (ভাঃ ২/১৬/১৭)।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতির সাম্য, অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। 'বিক্ষুব্ধ' শব্দটির বিশেষ অর্থ দাঁড়ায় 'বিস্ফোরণ'। বিগব্যাং থিওরি (Big Bang Theory) অনুযায়ী, একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল। ডা. এন. সি. বোস ওনার ***কোরআন বাইবেল বেদ ও বিজ্ঞান*** নামক বইয়ে ৯৭ নম্বর পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেন:

'জড়া প্রকৃতিকে ভগবান যখন তাহার অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা আধান করেন, তখন প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন, যাহাকে বলা হয় হিরণ্ময় (জ্বলন্ত বা উত্তপ্ত)। জড়া প্রকৃতি যখন বদ্ধ জীবের অদৃষ্টের দ্বারা ক্ষোভিত হন, তখন তা সংঘটিত হয়।' (ভাঃ ৩/২৬/১৯)।

শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতি যখন ক্ষোভিত বা বিস্ফোরিত হয়, তখন মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করে। এই ক্ষোভিত বা বিস্ফোরণকেই বিজ্ঞানীগণ বিগব্যাং বা বৃহৎ বিস্ফোরণ বলে থাকেন। বস্তুত বিগব্যাং মতবাদ অনুসারে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি বিন্দুতে স্তূপাকারে পুঞ্জীভূত ছিল। তারপর সেখানে, বিগব্যাং বা বৃহৎ বিস্ফোরণ সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে, বহু ছায়াপথ গঠিত হয়েছে। তারপর ছায়াপথগুলো নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়েছে।

বিগব্যাং বা বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি

প্রাচীন মিশরীয় পুরাণে আদিম মিশরীয় লোকদের মনে এই ভয় কাজ করত যে, 'নু' নামক আদিসত্তা আকাশের ভেতর দিয়ে ভেঙে পড়বে এবং নিমজ্জিত করবে পৃথিবীকে। এই ধারণাটি কিছুটা মিলে যায় পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত সুরা ফুরকানের ২৫ নম্বর আয়াতের সাথে, যেখানে বলা আছে:

'আর সেদিন আকাশ ভেঙে পড়বে মেঘমালার সঙ্গে, এবং ফেরেশতাদের নামিয়ে দেওয়া

হবে।'

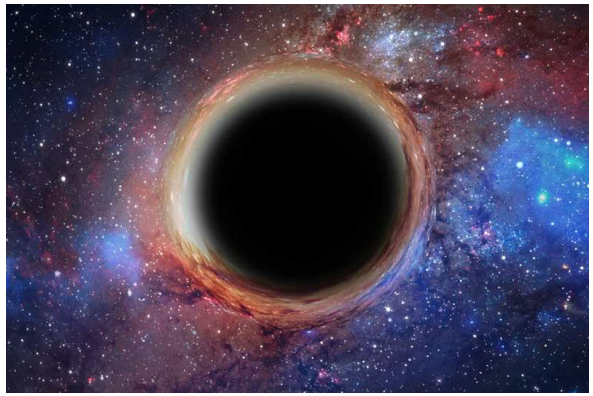

সুবিশাল কালো গহ্বর

মহাকাশে অধিক ভরবিশিষ্ট নক্ষত্রগুলোতে, তাদের জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে মহাকর্ষের কারণে খুব বেশি সংকুচিত হয়। এতে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়ে নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়ে যায় এবং সেটা পরিণত হয় একটি কালো গহ্বরে (Black Hole)। এই কালো গহ্বরে মহাকর্ষীয় বল এত শক্তিশালী যে, তা আলো পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারে না। এর কাছাকাছি কোনো বস্তু গেলে, এই সকল কালো গহ্বরগুলো মুহূর্তের মধ্যে তাকে টেনে নেয়। বস্তুত পদার্থবিদরা মনে করেন, মহাকাশে সময়ের অস্তিত্ব এই কালো গহ্বরে চিরতরে হারিয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, এটা তৈরি করবে মহাকাশের বাইরে যাওয়ার রাস্তা। সংকুচিত মহাকাশে বিপরীত মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে মহাকাশের সময় বিদীর্ণ হবে এবং ফাঁপা পৃথিবীর কেন্দ্রের গাগনিক পথে তৈরি হবে উপরের স্তরে যাওয়ার পথসমূহ।

(২)

প্রাচীন গ্রিক পুরাণ অনুসারে, 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে বিশৃঙ্খলা অবস্থান করছিল নিঃসীম ও অবিরাম অন্ধকারে। এই নিরাকার শূন্যতায় দুটি শিশুর জন্ম হলো, যাদের একজন হচ্ছে রাত্রি এবং অপরজন হচ্ছে অপরিমাপযোগ্য গভীরতা, যেখানে মৃত্যু বাস করে। তারপর অন্ধকার মৃত্যুর মধ্য থেকে জন্ম হলো প্রেমের এবং তার জন্মের সাথে সাথে 'বিশৃঙ্খলা কেটে গিয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকল শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য। 'এরপর, প্রেম সৃষ্টি করল আলো

এবং তার সাথি উজ্জ্বল রৌদ্রময় দিন। বস্তুত প্রেম এবং আলোর আগমনের সাথে সাথে পৃথিবীর মাতা গায়ার আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী সময়ে, গায়া ওনার অপরূপ সৃষ্টিকর্মের সাহায্যে মহাবিশ্ব সাজিয়ে তোলেন।

প্রাচীন গ্রিক পুরাণে, ১ নম্বর আন্ডারলাইন 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে বিশৃঙ্খলা অবস্থান করছিল' পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দেয়, সুদূর অতীতে মহাবিশ্বের সকল বস্তু একটি পিণ্ড আকারে জমাটবদ্ধ অবস্থায় ছিল। পরবর্তী সময়ে, সেই পিণ্ডে বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

প্রাচীন গ্রিক পুরাণে, ২ নম্বর ও ৪ নম্বর আন্ডারলাইন 'বিশৃঙ্খলা কেটে গিয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকল শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য' এবং 'গায়া ওনার অপরূপ সৃষ্টিকর্মের সাহায্যে মহাবিশ্ব সাজিয়ে তোলেন' প্রকাশ করে বিস্ফোরণ বা বিশৃঙ্খলার পরবর্তী অবস্থা। তথাপি, বিগব্যাং থিওরি (Big Bang Theory) অনুসারে, পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুগুলো চারিদিকে ছুটতে থাকে এবং সেগুলো থেকে কালক্রমে ছায়াপথ, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়। কবি মহারানা মৃগেন্দ্র আচারিয়া ওনার 'কে সে জন?' নামক পিরামিডাল কবিতায় লিখেছেন:

'ভুবন ও গগন,
যেন এক বিন্দুতে একাকার।
ঘটিল বিস্ফোরণ এই শূন্যের মাঝে,
উঠিল গড়ে সৌরধরা, একটি বৈচিত্র্যের সম্ভার।'

পৃথিবীর মাতা গায়া সাজাচ্ছেন মহাবিশ্ব

প্রাচীন গ্রিক পুরাণে, ৩ নম্বর আন্ডারলাইন 'এরপর, প্রেম সৃষ্টি করলো আলো এবং তার সাথি উজ্জ্বল রৌদ্রময় দিন' চিহ্নিত করে পবিত্র তৌরাত শরিফের এই নিচের উদ্ধৃতিটি:

'তারপর আল্লাহ্ বললেন, আকাশের মধ্যে আলো দেয় এমন সমস্ত কিছু দেখা দিক, আর তা রাত্রি হতে দিনকে আলাদা করুক। সেগুলো আলাদ আলাদা দিন, ঋতু আর বছরের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকুক। আকাশ থেকে সেগুলো দুনিয়ার ওপর আলো দিক...'। (পয়দায়েশ ১:১৪-১৫)।

(৩)

প্রাচীন পারস্য পুরাণে, পর্বতমালাকে মনে করা হতো পৃথিবীর মাটি ভেদ করে সৃষ্ট কোনো কিছু। 'আলবুর্জ' নামক পর্বতমালাকে বর্ণনা করা হয় জগতের প্রথম পর্বতমালারূপে এবং এর মূলসমূহ পৌঁছে গিয়েছিল পৃথিবী মাটির গভীর পর্যন্ত এবং শীর্ষ ছুঁয়ে ফেলেছিল আকাশ [***আভেস্তা*** (ইয়াশত ১৯:১)]। অধিকন্তু প্রাচীন পারস্য পুরাণে আলবুর্জ পর্বতমালার মূল থেকে জেগে উঠল 'হারা' নামক শিখর। নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র এবং সূর্যকে এই শিখরের চারদিকে আবর্তনরত বলে মনে করা হত।

প্রাচীন পারস্য পুরাণে ১ নম্বর আন্ডারলাইন 'প্রথম পর্বতমালারূপে এবং এর মূলসমূহ পৌঁছে গিয়েছিল পৃথিবীর মাটির গভীর পর্যন্ত' পবিত্র কুরআনে সুরা নাবার ৬ ও ৭ নম্বর

আয়াতদ্বয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়:

'আমি কি পৃথিবীকে পাতানো বিছানারূপে বানাইনি, আর পাহাড়-পর্বতকে পেরেকরূপে?'

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুল পঠিত একটি বই হলো ***আর্থ***। এই বইয়ের দুজন লেখকের একজন হলেন প্রফেসর ফ্র্যাংক প্রেস, যিনি এই বইটিতে উল্লেখ করেছেন, পর্বত মাটির গভীর তলদেশে শিকড়ের মতো প্রোথিত। এই শিকড়গুলোর গঠন পেরেকের মতো।

পেরেকের মতো প্রোথিত পাহাড়-পর্বতের তলদেশ

প্রাচীন পারস্য পুরাণে, দ্বিতীয় আন্ডারলাইন হলো 'নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র এবং সূর্যকে এই শিখরের চারদিকে আবর্তনরত বলে মনে করা হত'। ~~'এই শিখরের চারিদিকে আবর্তনরত~~' কথাটি বাদ দিলে, বাকি অংশ কুরআনের বর্ণনার সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। প্রাচীন পারস্যের লোকজন বিশ্বাস করত যে, নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র এবং সূর্য আদৌ স্থির

দণ্ডায়মান নয়, বরং বিচরণশীল। তথাপি, এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সুরা আম্বিয়ার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

'আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সকল আকাশি বস্তু নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।'

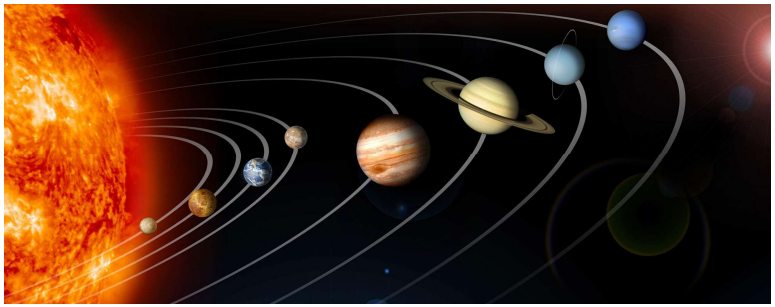

সকল আকাশি বস্তু নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে

(৪)

প্রাচীন মেসোপটেমিয় পুরাণ অনুসারে, ***এনুমা এলিশ*** নামক সৃষ্টির বিখ্যাত মহাকাব্যে কালের একদম প্রারম্ভ হিসেবে উল্লেখ আছে:

'তখনো দেওয়া হয়নি ওপরের আকাশের নাম
নিচে পৃথিবীকেও ডাকা হয় না কোনো নামে...'

তাই একইভাবে, পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারার ১১৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

'তিনি (আল্লাহ্) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী; তিনি যখন কিছু করতে চান, তখন সেটাকে বলেন 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।'

এ ছাড়াও বিশ্বজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে **প্রাচীন চৈনিক পুরাণে** পাওয়া যায়, ,জগৎ সৃষ্টির পূর্বে

ছিল বাষ্পের এক অবয়বহীন বিস্তার। কার্যত, ২কালের সূত্রপাতে সব পদার্থ ছিল একটি মুরগির ডিমের মতো। ১৮ হাজার বছর পর, ৩এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হল 'ইয়াং' নামক বায়বীয় পদার্থে, যা ওপরে উঠে গেল আকাশ সৃষ্টি করার জন্য এবং 'ইন' নামক ভারী পদার্থ ডুবে গিয়ে সৃষ্টি করল পৃথিবী।

প্রাচীন চৈনিক পুরাণে, ১ নম্বর আন্ডারলাইন 'জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ছিল বাষ্পের এক অবয়বহীন বিস্তার' ইঙ্গিত করে, বিশ্বজগতে ছায়াপথ গঠিত হওয়ার পূর্বে সৌর বস্তুগুলো বাষ্পীয় আকারে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ছায়াপথগুলো গঠনের পূর্বে ব্যাপক গ্যাসীয় বস্তু বা মেঘমালা সেখানে বিদ্যমান ছিল। তাই বাষ্পীয় বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পবিত্র কুরআনে সুরা হামীম-আস-সাজদার ১১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

'তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধোঁয়াময়...'

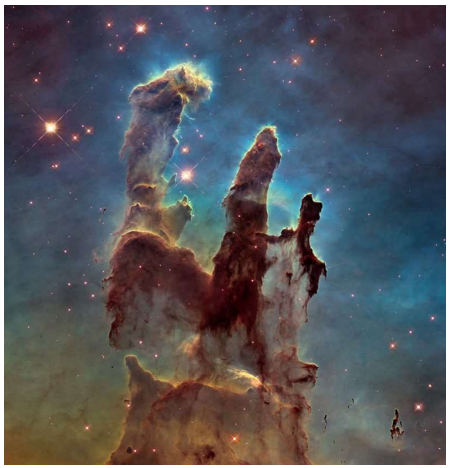

মহাকাশের মাঝে ধোঁয়াময় গ্যাসপিণ্ড

প্রাচীন চৈনিক পুরাণে, দ্বিতীয় আন্ডারলাইন 'কালের সূত্রপাতে সব পদার্থ ছিল একটি মুরগির ডিমের মতো' নির্দেশ করে যে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত কিছু একটি বিন্দুতে পুঞ্জীভূত ছিল, যাকে পরোক্ষভাবে একটি মুরগির ডিমের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

প্রাচীন চৈনিক পুরাণে, তৃতীয় আন্ডারলাইন 'এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হলো 'ইয়াং' নামক বায়বীয় পদার্থে, যা ওপরে উঠে গেল আকাশ সৃষ্টি করার জন্য এবং 'ইন' নামক ভারী পদার্থ ডুবে গিয়ে সৃষ্টি করল পৃথিবী' মনে করিয়ে দেয় পবিত্র কুরআনের সুরা যারিয়াতের ৪৭ ও ৪৮ নম্বর আয়াতের কথা, যেখানে বলা হয়েছে:

'আমি (আল্লাহ্) নিজের ক্ষমতায় আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী, আর আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি...'

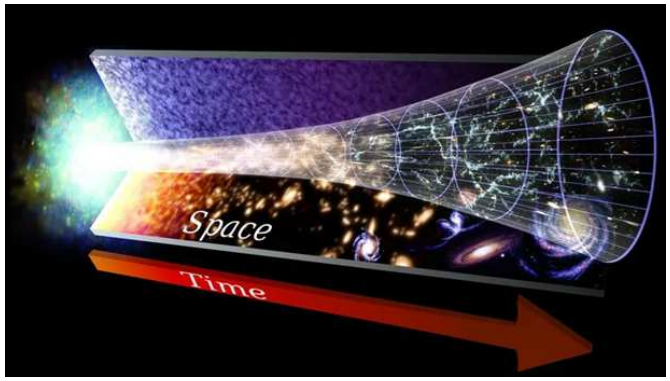

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ

১৯২৫ সালের দিকে, আমেরিকান বিজ্ঞানী এডউইন হাবল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টেলিস্কোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করেন, মহাকাশে ছায়াপথগুলো একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ মহাকাশের বিস্তার ঘটছে। বিখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিন্স ওনার ***কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*** বইয়ে লিখেছেন, মহাকাশ যে প্রসারিত হচ্ছে, এ তথ্যের আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর একটি চরম বুদ্ধিদীপ্ত বিপ্লব।

(৫)

প্রাচীন চৈনিক পুরাণের আরেকটি বর্ণনায়, ১আকাশ ও পৃথিবী মিশে ছিল অন্ধকারের মাঝে। সেই অন্ধকারে একটি বিশাল ডিম গঠিত হল, এবং সেই ডিমের মাঝে 'পাঙ্গু'

নামক এক দৈত্যের জন্ম হল। তখন 'পাঙ্গু' আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে উঠে দাঁড়াল এবং ১সে তার হাত দুটি দিয়ে আকাশকে তুলে ধরল এবং তার পা দুটি পৃথিবীতে রাখল। তারপর পাঙ্গুর দেহ লম্বা হতে থাকল, যা আকাশ ও পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। একসময় 'পাঙ্গু' ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার মৃত্যুর পর ৩তার চোখদ্বয় চন্দ্র ও সূর্যে পরিণত হয়ে আলোর দীপ্তি ছড়ায়। ৪তার শ্বাস পরিণত হয় বাতাস ও মেঘে। ৫তার চুল এবং দাড়ি পরিণত হলো আকাশের নক্ষত্রে। ৬তার দেহের মাংস পরিণত হলো মাটিতে। তার শরীরের ঘাম দ্বারা সৃষ্টি হলো শিশির এবং সব শেষে তার ধড় সৃষ্টি করল পর্বত।

পাঙ্গুর আকাশ ও পৃথিবী বিচ্ছিন্নকরণ

প্রাচীন চৈনিক পুরাণে ১ নম্বর আন্ডারলাইন 'আকাশ ও পৃথিবী মিশে ছিল অন্ধকারের মাঝে' ইঙ্গিত দেয় পবিত্র কুরআনের সুরা আম্বিয়ার ২১ নম্বর আয়াত, যেখানে আন্ডারলাইন করে আমরা এভাবে দেখবো:

'অবিশ্বাসীরা কি চিন্তা করে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে মিশে ছিল, অতপরঃ আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম...'

প্রাচীন চৈনিক পুরাণে দ্বিতীয় আন্ডারলাইন 'সে তার হাত দুটি দিয়ে আকাশকে তুলে ধরল এবং তার পা দুটি পৃথিবীতে রাখল। তারপর পাঙ্গুর দেহ লম্বা হতে থাকল, যা আকাশ ও পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করে দিল' নির্দেশ করে পবিত্র কিতাবুল মোকাদ্দস বা বাইবেলের এই উদ্ধিতিটি:

'আমি দুনিয়া সৃষ্টি করেছি ও দুনিয়ার ওপর মানুষ সৃষ্টি করেছি; আমি নিজ হাতে আকাশমণ্ডলী বিস্তীর্ণ করেছি...'। (ইশাইয় ৪৫:১২)।

পুনরায় যদি পবিত্র কুরআনের সুরা আম্বিয়ার ২১ নম্বর আয়াত আমরা দেখি, তাহলে সেটাকে এভাবে আন্ডারলাইন দিয়ে দেখবো:

'অবিশ্বাসীরা কি চিন্তা করে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে মিশে ছিল, অতপরঃ আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম...'

প্রাচীন চৈনিক পুরাণে তৃতীয় ও পঞ্চম আন্ডারলাইন, যথাক্রমে 'তার চোখদ্বয় চন্দ্র ও সূর্যে পরিণত হয়ে আলোর দীপ্তি ছড়ায়', এবং 'তার চুল এবং দাড়ি পরিণত হলো আকাশের নক্ষত্রে' এটাই প্রকাশ করে যে, বিগব্যাং থিওরি (Big Bang Theory) অনুযায়ী, বৃহৎ বিস্ফোরণের ফলে বহু ছায়াপথ গঠিত হয়েছে, পরিণতিতে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়েছে।

প্রাচীন চৈনিক পুরাণে চতুর্থ আন্ডারলাইন 'তার শ্বাস পরিণত হয় বাতাস ও মেঘে' ইঙ্গিত প্রদান করে পবিত্র জবুর শরিফের এই নিচের উদ্ধিতিটি:

> 'মাবুদের কালামে আকাশ তৈরি হয়েছে;
> তার মধ্যে যা আছে সেই সকল কিছু তৈরি হয়েছে
> ওনার মুখের শ্বাসে।' (জবুর ৩৩:৬)।

প্রাচীন চৈনিক পুরাণে ষষ্ঠ আন্ডারলাইন 'তার দেহের মাংস পরিণত হলো মাটিতে' জ্ঞাপন করে পবিত্র কুরআনে সুরা আর ২৮ নম্বর আয়াত, যেখানে উল্লেখ আছে:

'...তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে...'

চৈনিক পুরাণ ও পবিত্র কুরআনের আনডারলাইনদ্বয় 'তার (চৈনিক পুরাণে মহাবিশ্বের স্রষ্টা 'পাঙ্গু') দেহের মাংস পরিণত হলো মাটিতে', এবং 'আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে' পরোক্ষভাবে নির্দেশ করে **প্রাচীন সুমেরীয় পুরাণের** বয়ান, যেখানে উল্লেখ আছে, সুমেরীয় দেবতারা এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন প্রথম যুগের মানুষ। তারপর সেই মানুষগুলোর ধরনধারণ ও জ্ঞানবুদ্ধি প্রতিটি বিভিন্ন দেবতার প্রতিরূপ। অধিকন্তু একটু ভিন্নভাবে প্রায় একই ধরনের উদাহরণ পবিত্র তৌরাত শরিফের এই উদ্ধৃতিটিতে পাওয়া যেতে পারে:

'তারপর আল্লাহ্ বললেন, আমি আমার মত করে এবং আমার সাথে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি...।' (পয়দায়েশ ১:২৬)।

(৬)

প্রাচীন মিশরের থিবীয় ধর্মতত্ত্বে, ভেড়ার মাথাযুক্ত দেবতা 'খনুম' সৃষ্টি পুরাণে সূচিত করেন নতুন তাৎপর্য। কেননা, ওনার প্রধান কাজ ছিল মানব সৃষ্টি। ধারণা করা হয়, 'তিনি মানবরূপের ছাঁচ প্রদান করেন একটি কুমারের চাকার ওপর। প্রকৃতপক্ষে চাকার ওপর মানবদেহের ছাঁচ তৈরির মাধ্যমে খনুমের দেহব্যবচ্ছেদবিদ্যা সম্পর্কিত উপাত্ত সুস্পষ্টভাবে বিস্তারিত বর্ণিত আছে প্রাচীন মিশরীয় পুরাণে। তিনি অস্থির ওপর দিয়ে সঞ্চালিত করলেন রক্তধারা এবং শরীরের কাঠামোর সাথে যুক্ত করলেন চামড়া। তিনি শরীরে স্থাপন করলেন একটি শ্বসনব্যবস্থা এবং একে রক্ষা করার জন্য মেরুদণ্ড ও একটি পরিপাকযন্ত্র প্রস্তুত করলেন। প্রজনন ক্ষমতার জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন যৌনাঙ্গসমূহ, যাতে যৌনমিলনের সময় নিশ্চিত হয় পারমাঙ্গতা ও সন্তুষ্টি। 'তিনি গর্ভাশয়ে সন্তান ধারণের ব্যবস্থা করলেন এবং প্রসবের ধাপসমূহ সূচিত করলেন। এরপর, দেবতা, মানুষ, মাছ এবং সরীসৃপসমূহ সৃষ্টি করে তিনি হয়ে উঠলেন সর্বজনীন স্রষ্টা।

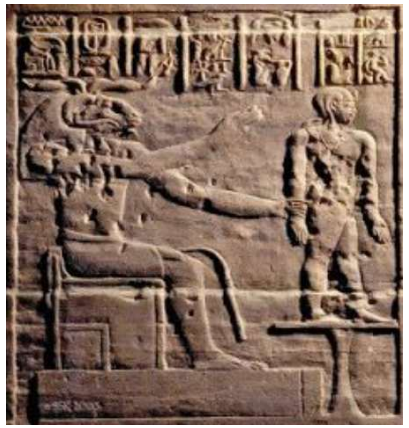

মিশরীয় দেবতা খনুমের মানব সৃষ্টি

প্রাচীন মিশরের থিবীয় ধর্মতত্ত্বে, ১ নম্বর আন্ডারলাইন 'তিনি মানবরূপে ছাঁচ প্রদান করেন একটি কুমারের চাকার ওপর' মনে করিয়ে দেয় পবিত্র কুরআনে সুরা আর-রহমানের ১৪ নম্বর আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে:

'তিনিই (আল্লাহ্) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির পাত্রের মতো শুষ্ক মাটি থেকে।'

এ ছাড়াও ডা. এন. সি. বোসের ***কোরআন বাইবেল বেদ ও বিজ্ঞান*** নামক বইয়ে ৩৪৯ নম্বর পৃষ্ঠার এই উদ্ধৃতিটিতে উল্লেখ আছে:

'গর্ভকালে শুক্র এবং শোণিত মিলিত হইয়া কলল আকার ধারণ করে। পরে কলল থেকে বুদবুদ আকার প্রাপ্ত হয়। চক্রের উপর মাটির পিণ্ড যেমন চক্রের ঘূর্ণন দ্বারা বিবর্তিত হইয়া ঘট শরাদি নানাকার ধারণ করে, আত্মাও তদ্রুপ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া কালবশে অস্থিযুক্ত বিবিধ মনঃসম্পন্ন মানুষরূপ উৎপন্ন করে।' (বায়ুপুরাণম্ ১৪/১৮-১৯)।

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, শুক্র ও শোণিত (ডিম্বাণু) মিলিত হয়ে কলল আকার ধারণ করে। কলল অণু পরিমাণ, যাকে বিজ্ঞানীরা জাইগোট (Gigot) বলে থাকেন।

এখানে ভ্রূণের বিবর্তনের একটি সুন্দর উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে, তা হলো কুমার যেমন চাকার ঘূর্ণন দ্বারা নরম মাটি থেকে ইচ্ছা অনুসারে, বিভিন্ন বস্তু তৈরি করতে পারেন, ঠিক তেমনি আত্মা কললটিকে বিবর্তিত করে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা ভ্রূণের বিবর্তন করে থাকে, কেননা ভ্রূণের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। তাই পবিত্র কুরআনে, সুরা সাজদার ৭ থেকে ৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে:

'যিনি (আল্লাহ্) অতি সুন্দররূপে ওনার প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে, তারপর তার (মানুষের) বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি তাকে (মানুষকে) সুঠাম করেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে আত্মা ফুঁকে দেন...'।

প্রাচীন মিশরের থিবীয় ধর্মতত্ত্বে, দ্বিতীয় আন্ডারলাইন 'তিনি গর্ভাশয়ে সন্তান ধারণের ব্যবস্থা করলেন এবং প্রসবের ধাপসমূহ সূচিত করলেন' ইঙ্গিত দেয় পবিত্র কুরআনের সুরা আল যুমারের ৬ নম্বর আয়াত, যেখানে উল্লেখ আছে:

'...তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক তিন স্তর অন্ধকারে...।'

মাতৃগর্ভে শিশুর দেহ গঠন

প্রফেসর কেইথ এল মুরের মতে, পবিত্র কুরআনের এই তিন স্তর অন্ধকার বলতে বোঝায়: ১. মায়ের গর্ভের সম্মুখের প্রাচীর, ২. জরায়ুর প্রাচীর এবং ৩. ভ্রূণের আবরণ।

মাতৃগর্ভে শিশুর রূপান্তর প্রক্রিয়া

অধিকন্তু, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুরা মুমিনুনের ১৪ নম্বর আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

'তারপর আমি (আল্লাহ্) শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, এরপর জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, অতঃপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করি হাড়গোড়, পরে হাড়গোড়কে ঢেকে দিই গোশত দিয়ে, তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে...'

(৭)

মেক্সিকোর প্রাচীন অ্যাজটেক পুরাণে, 'কুয়েটজালকোয়াটল' এবং 'তেজকটলিপোকা' নামক বিশাল দৈত্য 'লালটেকুইটলি' নামক প্রভুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে সাজিয়ে তোলেন স্বর্গরাজি ও পৃথিবীকে।

প্রাচীন অ্যাজটেক পুরাণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি

অধিকন্তু সুরা আম্বিয়ার ২১ নম্বর আয়াতটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, **প্রাচীন সুমেরীয় পুরাণে** দেখা যায়, দেবতাদের প্রধান একটি ভয়ংকর দৈত্যের সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন এবং তার দেহ দুই খণ্ড করে কেটে ফেলেন। তারপর সেই ১দৈত্যের দেহটির ঊর্ধাঙ্গ দিয়ে তৈরি করেন আকাশ, তারপর তা সাজালেন তরকামণ্ডলী দিয়ে। পৃথিবীর ভূভাগ এবং সেখানে রোপণ করলেন গাছপালা এবং ২সেখানে বসবাসের জন্য নিয়ে আসা হলো জীবজন্তুদের।

অতএব, অ্যাজটেক পুরাণের সংখ্যাহীন আন্ডারলাইন এবং সুমেরীয় পুরাণের ১ নম্বর আন্ডারলাইন 'অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে সাজিয়ে তোলেন স্বর্গরাজি ও পৃথিবীকে', এবং 'দৈত্যের দেহটির ঊর্ধাঙ্গ দিয়ে তৈরি করেন আকাশ, তারপর তা সাজালেন তরকামণ্ডলী দিয়ে' মনে করিয়ে দেয় পবিত্র কুরআনে সুরা আম্বিয়ার ২১ নম্বর আয়াত, যেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে:

'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে মিশে ছিল, তারপর আমি সেগুলো বিচ্ছিন্ন করে দিলাম...'

এরপর, সুমেরীয় পুরাণের দ্বিতীয় আন্ডারলাইন 'সেখানে বসবাসের জন্য নিয়ে আসা হলো জীবজন্তুদের' স্মরণ করিয়ে দেয় পবিত্র কুরআনে সুরা লুকমানের ১০ নম্বর আয়াত, যেখানে বলা আছে: 'তিনি (আল্লাহ্) আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং সেখানে (পৃথিবীতে) সব ধরনের জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন...।'

বিখ্যাত 'বিগব্যাং থিওরি' (Big Bang Theory) অনুযায়ী, অধিকাংশ মহাকাশবিজ্ঞানী মনে করেন, একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে সবকিছু ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট। তারপর এই ক্ষুদ্র বিন্দুটি প্রচণ্ড বেগে বিস্ফোরিত হলো। সমস্ত বস্তু, যা এর মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল চারিদিকে। তারপর খণ্ড খণ্ড ছড়িয়ে পড়া বস্তুগুলো একত্রে সংযুক্ত হয়ে তৈরি করল পরমাণু। এই পরমাণু থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হলো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রসমূহ। তাই পরমাণু সম্পর্কে, ডা. এন. ডস. বোস ওনার ***কোরআন বাইবেল বেদ ও বিজ্ঞান*** নামক বইয়ে ৫৩, ও ১৫১ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন:

'পরমাণু হইতেছে ব্যক্ত জগতের চরম অবস্থা। যখন তাহারা বিভিন্ন প্রকারের শরীর নির্মাণ না করিয়া তাহাদের স্বরূপে স্থিত থাকে, তখন তাহাদের বলা হয় পরম মহৎ। ভৌতিকরূপে নিশ্চয়ই অনেক প্রকারের শরীর রইয়াছে, কিন্তু পরমাণু দ্বারা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়'। (ভাঃ ৩/১১/২)।

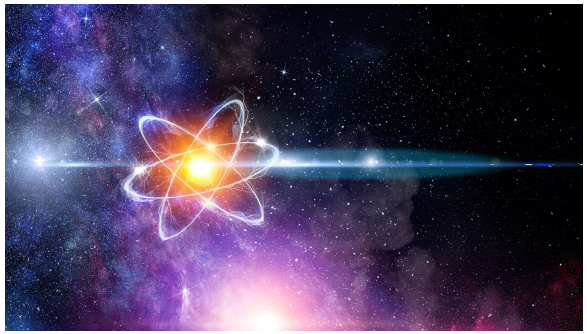

পরমাণু দ্বারা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে সহজেই বলা যেতে পারে, এই মহাবিশ্বের সবকিছুই পরমাণু দ্বারা

গঠিত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পুরাণ হল স্মৃতি ও কল্পনার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া। আমাদের স্মৃতি যত পুরোনো, তত বেশি কল্পনা একে আঁকড়ে ধরে। যখন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ধর্মীয় মতবাদ এই প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত করে, তখন পুরাণসমূহ খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রবন্ধটিতে আমি নিজে একজন শল্যচিকিৎসকের ভূমিকায় নেমেছি এবং প্রাচীন পুরাণগুলো থেকে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে সৃষ্টি ও স্রষ্টার গোড়াপত্তন বের করে আনার চেষ্টা করেছি। ফলস্বরূপ, অনেক সংশয়ী ব্যক্তিদের মনে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হতে পারে যে, বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ধর্মগ্রন্থগুলো প্রাচীন পুরাণগুলোর পরোক্ষ অনুলিপি। তবে এরূপ ধারণার বিপরীতে আমি পবিত্র কুরআন থেকে দুটি আয়াত উল্লেখ করব:

প্রথমত, পবিত্র কুরআনে সুরা ফাতিরের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

'...এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যার কাছে আমি সতর্ককারী পাঠাইনি।'

এবং, পবিত্র কুরআনে সুরা নাহলের ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন:

'...আল্লাহ্র ইবাদত করার ও মন্দকে পরিহার করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য, আমি তো প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসুল পাঠিয়েছি...'

অতএব, মহান আল্লাহ্ তাআলা মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই, মানবজাতির জন্য সর্বদা পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মতবাদ সম্পর্কে বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে প্রাচীন পুরাণগুলোর কিছু কিছু অংশ মিলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেহেতু আদিম সময়ে, অধিকাংশ লোকজনদের মাঝে লিখনপদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি। তাই হতে পারে, সেই সময়ের ধর্মীয় মতবাদগুলো কালের বিবর্তনে বিকৃত হয়ে বর্তমানে পুরাণরূপ ধারণ করেছে। যদিও, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

মহাবিজ্ঞানী নিউটন কাদের উত্তরসূরি?

আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর পূর্বে, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজে একজন অখ্যাত ছেলে অধ্যয়ন করত। ছাত্র হিসেবে ছেলেটি ছিল যেমন অধ্যবসায়ী তেমনি মেধাসম্পন্ন। তার সবচেয়ে বেশি দখল ছিল গণিতে। যেকোনো জটিল অঙ্ক সে সহজেই সমাধান করতে সক্ষম ছিল। তবুও অঙ্কের প্রতি তার বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না। কারণ প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করত। ছেলেটি প্রকৃতপক্ষে আর কেউ নয়, ইংরেজ মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ)। নিউটন সর্বদা বিশ্বাস করতেন, একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকৃতির এই গোপন রহস্যকে উদঘাটন করা সম্ভব। কলেজে ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায়, তিনি গণিতে পরিবর্তমান রাশির বৃদ্ধি-হার (Fluxion) নিয়ে কাজ করেন, যা বর্তমানে সমাকলন (Integral Calculus) হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অধিকন্তু ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, নিউটন ওনার একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে তত্ত্বপ্রকল্প তৈরি করছেন। ভাবতে অবাক লাগে, সেই সময় ওনার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। যদিও, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ইতিহাস থেকে জানা যায়, নিউটনের জন্মের বহু আগেই, এই সকল তত্ত্ব নিয়ে লিখিতভাবে আলোচিত হয়েছে, যা অধিকাংশ মানুষের নিকট অজানা। তাই আমার এ ছোট্ট রচনার উদ্দেশ্যই হল, ওই সকল গুপ্ত তত্ত্বগুলিকে ঐতিহাসিকরূপে সকলের সামনে উন্মোচিত করা।

১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে, ইংরেজ পাদরি ও পুরাতত্ত্ববিদ উইলিয়াম স্টাকলি (১৬৮৭-১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ওনার লেখা ***Memoirs of Sir Isaac Newton's Life*** বইয়ে ১৫.৪.১৭২৬ তারিখে কেনিংস্টনে ওনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিউটনের সাথে নিজের কথোপকথনের বর্ণনা দেন। সেই বর্ণনা অনুযায়ী, একদিন নিউটন গবেষণার মেজাজ নিয়ে একটি আপেল গাছের নিচে বসে ছিলেন। এমন সময়, একটি আপেল মাটিতে পতিত হয়। তখন তিনি নিজের মনে কিছু প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে থাকেন: '(ক) আপেলটি কোনো সব সময় অভিলম্ব বরাবর মাটির দিকে পতিত হয়? (খ) আপেলটি কোনো পাশে কিংবা ওপরের দিকে যায় না? (গ) আপেলটি কোনো সর্বদা পৃথিবীর আকর্ষণকেন্দ্রের দিকে পতিত হয়?' নিউটনের এই সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে অভিকর্ষ। প্রকৃতপক্ষে অভিকর্ষ হলো কোনো বস্তুর

ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আমরা জানি, আইজ্যাক নিউটনই সর্বপ্রথম অভিকর্ষজ বলের ধারণা প্রদান করেন। সত্যি কি তাই? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পেতে আমাদের ঘাঁটতে হবে অতীতের কিছু গবেষণামূলক দলিল।

নিউটনের বিখ্যাত সেই আপেলগাছটির প্রত্যক্ষ বংশধর

পৃথিবীর ইতিহাসে যত সাহিত্য রচিত হয়েছে, অথবা যত সাহিত্য এখন পর্যন্ত টিকে আছে কিংবা পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো ***গিলগামেশের মহাকাব্য***। প্রকৃতপক্ষে এই মহামূল্যবান ***গিলগামেশের মহাকাব্য*** হচ্ছে কিউনিফর্ম নামক বহুসংখ্যক কিলক দ্বারা নির্দেশিত ও সুগম্ভীর ভাষায় বর্ণিত পৌরাণিক নায়ক গিলগামেশের কীর্তিকাহিনি, যা লেখা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২১০০ অব্দের দিকে। প্রাচীন বহুঈশ্বরবাদী সুমেরীয় অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত এই প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের চতুর্থ ফলকের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, দূর থেকে আসা ধুলোর ঝড়ের কথা। আকাশ গর্জে উঠল, মাটি উঠল কেঁপে। তারপর শামাশ (সূর্যদেবতা) গিলগামেশের দেহের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সীসের মতো করে এবং চেপে ধরলেন গিলগামেশকে ওনার বিশাল পক্ষ আর ধারালো নখ দিয়ে। সেই সময় গিলগামেশের মনে হলো, সে যেন একখানা বিশাল প্রস্তরখণ্ডের নিচে চাপা পড়েছে।

কিউনিফর্ম খোদিত গিলগামেশের মহাকাব্যের চতুর্থ ফলক

বিশ্বখ্যাত সুইস লেখক এরিক ফন দানিকেন ওনার জার্মান ভাষায় লেখা ***Erinnerungen an die Zukunft*** বইয়ে এরূপ বর্ণনা সম্পর্কে আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, '... প্রাচীন কাহিনিকারগণ কেমন করে জানলেন, একটি বিশেষ ত্বরণের মাধ্যমে যেকোনো বস্তু সীসের মতো ভারী হয়ে ওঠে?' আজকের দিনে আমরা জানি, ত্বরণ হলো সময়ের সাপেক্ষে বস্তুর অসম বেগের পরিবর্তনের হার। সুতরাং গিলগামেশের এ ঘটনাটি মূলত অভিকর্ষজ ত্বরণকে নির্দেশ করে। বলবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, অভিকর্ষজ ত্বরণ হচ্ছে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হার।

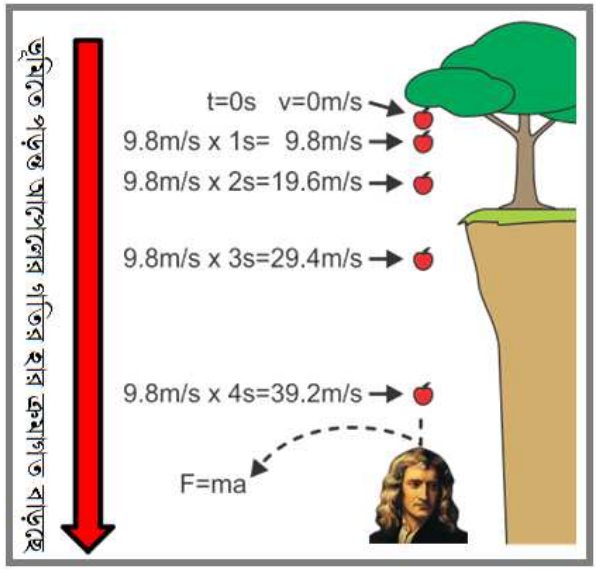

অভিকর্ষজ ত্বরণের একটি প্রতিমান

যাই হোক, প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ) বিশ্বাস করতেন, কোনো নিমিত্ত ছাড়া গতি আদৌ সম্ভব নয়। উনি আরো মনে করতেন, পার্থিব উপাদানগুলো তাদের চারিত্র্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা তাদের নিম্নমুখী চালিত করে নিয়ে যায় পৃথিবীর আকর্ষণকেন্দ্রে, যেটা হচ্ছে তাদের প্রকৃত নৈসর্গিক স্থান। অধিকন্তু অ্যারিস্টটল পতনের গতি সম্পর্কে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, ভারী বস্তুসমূহের পতনের গতি সর্বদা হালকা বস্তুসমূহের গতির তুলনায় বেশি দ্রুতগামী হয়ে থাকে। অন্যদিকে প্রাচীন রোমান স্থাপত্যশিল্পী ও সামরিক যন্ত্রকুশলী মার্কাস ভিটরুভিয়াস পোলিও (খ্রিস্টপূর্ব ৮৫-২০ অব্দ) ওনার ***De Architectura*** গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে অ্যারিস্টটলের বিরোধিতা করে বলেন, 'মাধ্যাকর্ষণ ব্যাপারটি আদৌ পদার্থের ওজনের ওপর নির্ভর করে না, বরং সেটা নির্ভর করে পদার্থের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ওপর।'

একসময় ভারতের বুকে সনাতন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে, ***সূর্য সিদ্ধান্ত*** নামক জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন অংশ সমন্বিত একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়। কার্যত এই মূল্যবান গ্রন্থখানা রচিত হয়েছিল আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর দিকে। যাই হোক, এই গ্রন্থটিতে

মাধ্যাকর্ষণ বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ আছে: 'পদার্থসমূহ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির কারণে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়...।' অধিকন্তু ভারতীয় গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দ-৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিবৃতি হিসেবে একসময় এভাবে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমরা জানি যে, পৃথিবীর উপরিভাগের সকল পার্শ্ব একই ধরনের, যখন সকল মানুষ পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রকৃতির নিয়মে, সকল ভারী বস্তু নিচে মাটির ওপর পতিত হয়। এটাই পৃথিবীর স্বধর্ম, যা বস্তুসমূহকে আকর্ষণ করে এবং ধারণ করে।'

পারসিক মুসলিম পণ্ডিত বাদী আল-জামান-আল-হামাযানি (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ-১০০৭ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি সংক্ষেপে আল হামাযানি নামে পরিচিত। উনি ওনার ***আল-গাওহারাতিন আল-আতিকাতিন আল-মাতিন মিন আল-সাফারা ওয়া আল বিদা*** গ্রন্থে বলেন, 'ভূমির নিচে এবং ভূমির ওপরে যা-ই থাকুক না কেন, সবকিছু রয়েছে অবিচল অবস্থায়। বস্তুত ভূমি হলো সেই চুম্বকের মতো, যা লৌহকে আকর্ষণ করে সকল দিক থেকে।' তারপর আরেক পারসিক মুসলিম বিদ্বজ্জন আবু রায়হান মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল বিরুনি (৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ-১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি সংক্ষেপে আল বিরুনি নামে খ্যাত। মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে তিনি ওনার ***আল কানুন উল মাসুদী*** গ্রন্থে বলেন, 'ভূমিদেশের ওপরে অবস্থিত বস্তুসমূহ তার নিজ আকর্ষণকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে থাকে।'

দক্ষিণ ভারতের বিজ্জবিড় নগরে বাস করতেন একজন ব্রাহ্মণ। নাম তাঁর ভাস্কারাচার্য (১১১৪ খ্রিষ্টাব্দ-১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)। গণিত ও জ্যোতিষ উভয় বিষয়েই ছিল ওনার অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি নিজেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ওনার সংস্কৃত ভাষায় বলেন:

'আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া,
যৎঘস্থং গুরু বাড়িমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি
সমে সমান্তারক্ক পত ত্বীয়ং খে।'

অর্থাৎ 'পৃথিবীর একধরনের আকর্ষণী বল আছে। তাই কোনো বস্তু উৎক্ষিপ্ত হলে, এই আকর্ষণী শক্তির দ্বারাই তা পুনরায় ভূমিতে পতিত হয়।' ভাস্কারাচার্য মূলত ছিলেন দ্বাদশ

শতাব্দীর পণ্ডিত। ওনারই সমসাময়িক গ্রিক বংশোদ্ভূত মুসলিম মনীষী আবুল ফাত আব্দুল রহমান মনসুর আল-খাযিনি, যিনি সংক্ষেপে আল খাযিনি নামে প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়, তিনি নিজের লেখা ***মিযান আল-হিকমা*** বইয়ে বলেছেন, 'বস্তু নিজেই অনবরত ভূমিদেশীয় আকর্ষণকেন্দ্রের দিকে চালিত হয়।' পরবর্তী সময়ে, আধুনিক কালের একজন মিশরীয় পণ্ডিত অধ্যাপক আহমেদ ফুয়াদ পাশা ওনার ***The Islamic Scientific Heritage: Something from the Past of an Asset for the Future*** বইয়ে আল খাযিনির বৈজ্ঞানিক কর্ম সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেন:

'আল খাযিনি ভূতলে পতিত পদার্থসমূহের বেগবৃদ্ধির ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি ওনার ***মিযান আল-হিকমা*** নামক বইয়ের মাধ্যমে পাঠকদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভূমির উপরিভাগে পতিত পদার্থসমূহের গতি এবং পদার্থগুলোর পতনের দূরত্ব ও সময়ের সংযুক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে, গ্যালিলিও ওনার নিজ গাণিতিক সমীকরণে আল খাযিনির এই গতি, দূরত্ব ও সময়ের যোজনসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেন।'

স্পেনীয় মুসলিম বিজ্ঞানী আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আস সাইগ আত তুজিবি ইবনে বাজ্জাহ আল তুজিবি (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ-১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি সংক্ষেপে ইবনে বাজ্জাহ নামে সুপরিচিত। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কখনো অন্য চিন্তাবিদদের মতো ছিলেন না। অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালের চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করতেন, কোনো বস্তুর চারিদিকে বাতাসের সকল প্রতিরোধ শক্তি অপসারণ করা হলে, বস্তুটি তখনই অসীম গতি লাভ করবে। ইবনে বাজ্জাহ ওই সকল চিন্তাবিদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। বস্তুত তিনি মনে করতেন: 'আমরা যদি কল্পনা করি, কোনো বস্তু থেকে সব প্রতিরোধ শক্তি অপসারণ করা হয়েছে, তাহলে বস্তুটির নির্ভেজাল অথবা প্রকৃতিদত্ত গতি প্রকাশ পাবে।'

ইবনে বাজ্জাহ ওনার তত্ত্বটি গাণিতিকভাবে প্রকাশ করতে না পারলেও, ওনার গবেষণায় এ আভাস পাওয়া গেছে যে, সকল প্রতিরোধ থেকে মুক্ত কোনো বস্তুর গতি হবে সূচক। কার্যত ওনার এই তত্ত্বটি মুক্ত অবস্থায় বস্তুর পতন সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান থেকে অনেক দূরে হলেও, তা গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ-১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ) হলেন খ্যাতনামা ইতালিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যিনি পড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে তিনটি সূত্র প্রদান করেছিলেন। কার্যত ওনার

ওই সকল সূত্রগুলোকে পড়ন্ত বস্তুর সূত্র বলে। সূত্রগুলো শুধু স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওনার সূত্রগুলো নিচে প্রদত্ত হল:

১. স্থির অবস্থান থেকে এবং একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে।

২. স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ ওই সময়ের সমানুপাতিক।

৩. স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তা ওই সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।

স্থির অবস্থান এবং একই উচ্চতা থেকে একটি পালক ও একটি হাতুড়ি একই সাথে ফেলে দিলে, তা একই সাথে মাটিতে পড়বে। কিন্তু বাতাসের বাধার কারণে এমনটি আদৌ হয় না। তবে বাতাসের বাধা না থাকলে, পালক ও হাতুড়ি একই সাথে মাটিতে পড়বে। আমরা জানি চন্দ্রপৃষ্ঠে কোনো বাতাস নেই, তাই অবিসংবাদিতরূপে চন্দ্রপৃষ্ঠকে শূন্যস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সেখানেও, পালক ও হাতুড়ি একই সাথে ভূমিতে পতিত হবে। সে যাই হোক, আমেরিকান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী ও লেখক মাইকেল এইচ হার্ট ওনার ***The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*** বইয়ে বলেন, 'আইজ্যাক নিউটন পরবর্তী সময়ে বলবিদ্যার যে সকল সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, গ্যালিলিও সেগুলোর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

গ্যালিলিওর মননে পড়ন্ত বস্তুর আধুনিক প্রয়োগ

অধিকন্তু ভলটেয়ার (১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ-১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) নামক একজন ফরাসি ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক ওনার ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে লেখা প্রবন্ধ "Essay on Epic Poetry"-এর বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে গাছ থেকে আপেল পতনের ঘটনাই নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের বুনিয়াদ গড়ে দেয়। মহাকর্ষ হলো মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ। বস্তুত নিউটন ভেবে দেখেন, অভিকর্ষজ বল পৃথিবী থেকে কেবল একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং এই বলটি নিশ্চয়ই পৃথিবীর বাইরেও অবস্থান করে। নিজের মনে নিউটন বলে যেতে থাকেন, এই বলটি কেনই বা চন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত হবে না, আর সে ক্ষেত্রে এটি চাঁদের গতিকে প্রভাবিত করে, তাকে সম্ভবত নিজের কক্ষপথে স্থান করে দেয়।

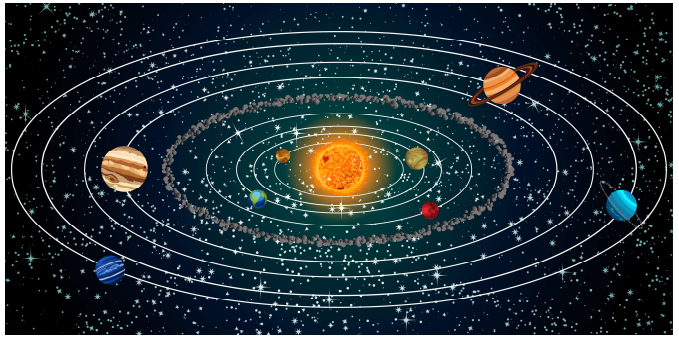

মহাকাশের মাঝে মহাকর্ষীয় প্রতিমান

নিউটনের এই মহাকর্ষ সম্পর্কিত চিন্তন মাথায় রেখে, যদি আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর দিকে লেখা ***সূর্য সিদ্ধান্ত*** নামক জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন অংশ সমন্বিত একটি সুসংবদ্ধ বইয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাহলে আমরা সেখানে পাব: 'পদার্থসমূহ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির কারণে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। তথাপি, এই একই শক্তির মাধ্যমে, পৃথিবী, গ্রহসমূহ, নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্র এবং সূর্য, তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে অবস্থান করে।' অতএব বোঝা যাচ্ছে, নিউটনের পূর্বেও মহাকর্ষ সম্পর্কিত ধারণা লিখিতরূপে বিদ্যমান ছিল। যাই হোক, নিউটন মহাকর্ষ সম্পর্কে একটি সূত্রও প্রদান করেন, তা হচ্ছে:

'মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক, আর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক, এবং এই বল সংযোগ সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।'

কার্যত, নিউটনের এই সূত্রমতে, এই বলটি শুধু দূরত্ব ও ভরের ওপর নির্ভরশীল। নিউটন আরো দেখান যে, এই মহাকর্ষীয় বল যদি দূরত্বের বিপরীত বর্গীয় সূত্রানুসারে কমতে থাকে, তাহলে চন্দ্রের কক্ষীয় পর্যায়ের যে মান পাওয়া যায়, তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ধারণা করেন, এই একই বল অন্যান্য কক্ষীয় গতির জন্য দায়ী। এই কারণে, নিউটন এটাকে নিখিলসৃষ্টিব্যাপী মহাকর্ষ নামে আখ্যায়িত করেন।

কক্ষীয় গতির ব্যাপারে যদি অতীতে দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাহলে আমরা প্রারম্ভেই পাব গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ)-এর বক্তব্য। প্রকৃতপক্ষে অ্যারিস্টটল গতি সম্পর্কে বেশ গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। উনি মনে করেন, গতি হলো তিন প্রকার, যথা: বৃত্তাকার গতি, সরলরেখার গতি এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে উৎপন্ন মিশ্র গতি। এই তিন ধরনের গতির মধ্যে বৃত্তাকার গতিই বিরামহীন ও সীমাহীন। এই কারণে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ এবং নক্ষত্রের বিরামহীন গতিই হলো বৃত্তাকার গতি। সত্যি বলতে, অ্যারিস্টটলের মতে এরূপ গতিই নিখুঁত।

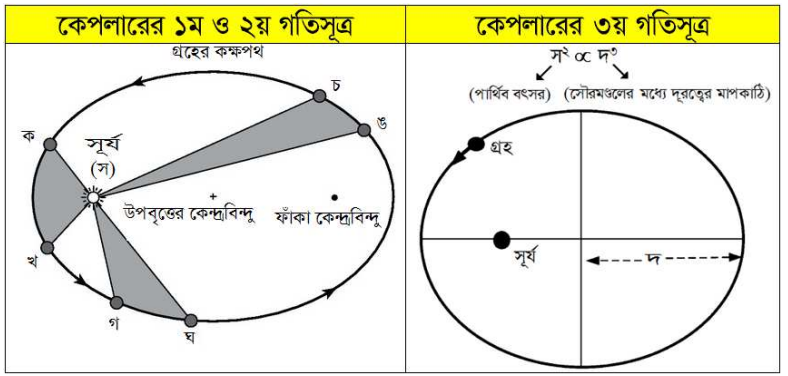

কেপলারের গ্রহীয় গতিসূত্রের জ্যামিতিক ধারণা

অ্যারিস্টটল ছাড়াও, আমরা পাব কেপলারের গ্রহীয় গতিসূত্র। এই গতিসূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুবিদিত জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইওহাননেস কেপলার (১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ-১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)। বস্তুত ওনার গতিসূত্র সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলোর গতি ব্যাখ্যা করে। তিনি মূলত গ্রহ সম্পর্কিত গতির ওপর তিনটি সূত্র প্রদান করেছেন, যা পরবর্তীকালে কেপলারের সূত্র হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়। সূত্রগুলো হচ্ছে:

১. প্রতিটি গ্রহের কক্ষপথ একটি উপবৃত্ত, সূর্য যার একটি কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, এবং উপবৃত্তের আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু হল ফাঁকা।

২. সূর্য এবং একটি গ্রহকে সংযোগকারী রেখা, গ্রহের আবর্তনের সাথে সাথে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে। উদাহরণস্বরূপ, কেপলারের এই সূত্রটি উপরোক্ত চিত্রে উপস্থাপিত তিনটি ছায়াময় অংশের সমতার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন: 'ক খ স', 'গ ঘ স', এবং 'ঙ চ স'।

৩. একটি গ্রহের পর্যায়কালের বর্গ সূর্য হতে ওই গ্রহের গড় দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ $স^২ \propto দ^৩$ (স = সময়কাল, এবং দ = দূরত্ব)।

পদার্থ যে অবস্থায় আছে, চিরকাল সেই অবস্থায় থাকার প্রবণতাকেই বলে জড়তা।

জড়তা দুই প্রকার, যথা: স্থিতি জড়তা এবং গতি জড়তা। পারসিক মুসলিম চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা (৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ-১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি সংক্ষেপে ইবনে সিনা নামে বিখ্যাত। তিনি ওনার ***কিতাব আল ইশরাত ওয়া তানবিহাত*** গ্রন্থে পাঠকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি জানেন? যদি বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করা হয়, তবে স্থির বস্তু সর্বদা স্থিরই থাকে।' বস্তুত ওনার এই তত্ত্বটি ছিল 'স্থিতি জড়তা' ধারণার অনুরূপ। অধিকন্তু আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্থিতি জড়তা হলো, স্থিতীশীল বস্তুর চিরকাল স্থির থাকার প্রবণতা। অপরদিকে ইরাকি মুসলিম বিজ্ঞানী আবু আলী আল-হাসান ইবনে আল-হাসান ইবনে হাইসাম (৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ-১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি সংক্ষেপে ইবনে হাইসাম নামে পরিচিত। তিনি ওনার ***রিসালা-ফিল-মাকান*** গ্রন্থে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন: 'বাহ্যিক শক্তি বাধা না দিলে, অথবা বস্তু তার গতি পরিবর্তন না করলে, বস্তু সর্বক্ষণ সচল থাকে।' কার্যত ওনার এই তত্ত্বটি ছিল 'গতি জড়তা' ধারণার অনুরূপ। এ ছাড়াও বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে গতি জড়তা হচ্ছে, গতিশীল বস্তুর চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকার প্রবণতা।

স্থিতি জড়তা এবং গতি জড়তার ধরন

সত্যি বলতে, জড়তা সম্পর্কিত ধারণাটিকে ব্যবহার করে, ইতালির প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ-১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ) পরবর্তী সময়ে ওনার নিজস্ব 'ঘর্ষণজনিত বল' সম্পর্কিত একটি বিশেষ 'চিন্তন' প্রতিষ্ঠা করেন। উনি যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, গতিশীল বস্তুসমূহ একধরনের বলের দ্বারা একসময় থেমে যেতে বাধ্য হয়। কার্যত সেই বলটি হল ঘর্ষণ। গ্যালিলিওর 'ঘর্ষণজনিত বল' সম্পর্কিত চিন্তনটি প্রকৃষ্ট বলবিজ্ঞানে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করে এবং আরো পরে নিউটনের প্রথম গতিসূত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যদিও নিউটনের পূর্বে, পারসিক মুসলিম চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ইবনে সিনা (৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ-১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) ওনার ***কিতাব আল-শিফা*** গ্রন্থে উল্লেখ করেন: 'গতিশীল বস্তুর পথে কোনো বাধা না এলে, প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি অবিরত চলতে থাকবে।'

পক্ষান্তরে নিউটন ওনার বিখ্যাত ***Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*** গ্রন্থে প্রথম গতিসূত্র হিসেবে লিখেছেন, 'বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থিরই থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরল পথে চলতে থাকবে।'

নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের একটি নমুনা

তারপর, ইরাকের ইহুদি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ও দার্শনিক হিবাত-আল্লাহ্ ইবনে আলী ইবনে মালেক আবুল বারকাত আল-বাগদাদী (১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দ-১১৫২ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি সংক্ষেপে আল বাগদাদী নামে পরিচিত। তিনি ওনার ***কিতাব-আল-মুতাবার ফি আল-হিকমা*** নামক গ্রন্থে লিখিতরূপে বলেন, 'শক্তিশালী বল প্রয়োগে বস্তু দ্রুত চলে এবং স্বল্প সময় নেয়। যদি বল প্রয়োগ কমানো না হয়, তাহলে গতিও কমবে না।' এ ছাড়াও একই গ্রন্থে তিনি আরো বলেন, 'যদি বেশি বল প্রয়োগ করা হয়, তবে বস্তু দ্রুত বেগে চলবে

এবং কম সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করবে।' অপরদিকে একই সূত্র ধরে, নিউটন ওনার বিখ্যাত ***Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*** বইয়ে দ্বিতীয় গতিসূত্র হিসেবে লিখেছেন, 'বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার-এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।'

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রের একটি নমুনা

সব শেষে, ইরাকি মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে হাইসাম (৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ-১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ) ওনার ***কিতাব আল-মানাযির*** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'যদি চলমান বস্তু কোনো প্রতিবন্ধকতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বলের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে প্রতিবন্ধক বলের অনুপাতে চলমান বস্তুটি সমবেগে বিপরীত দিকে ফিরে আসে।' অধিকন্তু ইরাকের ইহুদি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ও দার্শনিক আল-বাগদাদী (১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দ-১১৫২ খ্রিষ্টাব্দ), ওনার ***কিতাব-আল-মুতাবার ফি আল-হিকমা*** গ্রন্থে বাস্তবসম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন, 'কুস্তির সময় একে অন্যের ওপর বল প্রয়োগ করে, এতে যদি দুজনের একজন পিছু হটে যায়, তার মানে এই নয় যে, পিছু হটে যাওয়া ব্যক্তির বলের বলের অস্তিত্ব নেই, বরং পিছু হটে যাওয়া ব্যক্তির বল ব্যতীত প্রথম ব্যক্তির বল প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।' এরপর, স্পেনীয় মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে বাজ্জাহ (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ-১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) একসময় প্রচার করেন, 'কোনো বস্তুতে শক্তি প্রয়োগ করা হলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়।' এ ছাড়াও পারসিক মুসলিম দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ-১২০৯ খ্রিষ্টাব্দ) ওনার ***মাবাহিত আল মাসরিকাইয়াহ ফি ইলম আল ইল্লাইয়াত ওয়া আল তাবিয়াত*** গ্রন্থে বলেছেন, 'দুটি সমান বল বৃত্তটিকে টানতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বৃত্তটি মাঝখানে থেমে যায়। এখানে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, উভয় বল একটি করে কাজ সম্পাদন করছে, যা একে অন্যের বিপরীত।' সুতরাং এই সকল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য

রেখে, নিউটন ওনার প্রসিদ্ধ ***Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*** বইয়ে তৃতীয় গতিসূত্র হিসেবে লিখেছেন, 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।'

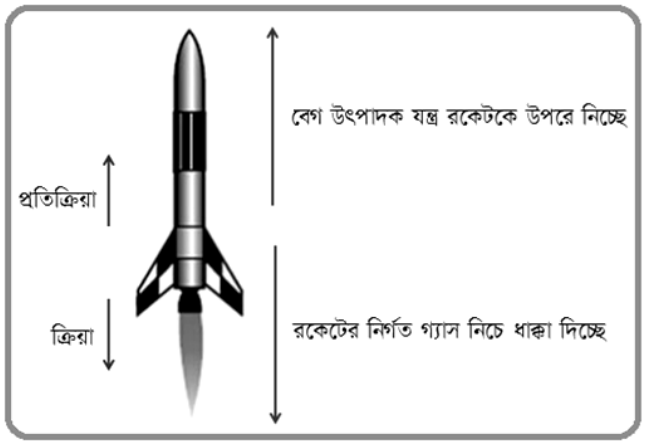

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের একটি নমুনা

এবার নিউটনের গণিত সম্পর্কিত বিষয়ে আসা যাক। বর্তমান সময়ে, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে কলনবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। প্রাথমিক বীজগণিতের মাধ্যমে যে সকল জটিল ও বড় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, সেগুলোকে সমাধান করতে সহায়তা করে কলনবিদ্যা (Calculus)। যাই হোক, ইরাকি মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে হাইসাম (৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ-১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ) ওনার ***কিতাব আল-মানাযির*** বইয়ের পঞ্চম খণ্ডে গাণিতিক আরোহ প্রণালির মাধ্যমে এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যাকে যেকোনো পূর্ণ সংখ্যার সূত্র উদ্ধার করতে তৎক্ষণাৎ সাধারণ শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে। তিনি পূর্ণ সংখ্যার মাধ্যমে অধিবৃত্তের একটি আয়তন বের করার জন্য পূর্ণ সংখ্যার ওপর তার ফলাফল প্রয়োগ করেন। অধিকন্তু তিনি চতুর্থ ডিগ্রি পর্যন্ত বীজগণিতের বহুপদের জন্য অখণ্ড সংখ্যা উদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং যেকোনো বীজগণিতের বহুপদের অখণ্ড সংখ্যার জন্য একটি সাধারণ সূত্র উদ্ভাবন করার কাছাকাছি পৌঁছে যান। প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল ওনার অতি ক্ষুদ্র রাশি এবং সমগ্র কলনবিদ্যা উন্নয়নে একটি মৌলিক অবদান। এরপর, পারসিক মুসলিম গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল

হুসাইন আল-কারাযি (৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ-১০২৯ খ্রিষ্টাব্দ) ওনার লেখা ***ইকসতরাইত দ্যু ফাকরী*** বইয়ে বীজগাণিতিক কলনবিদ্যার প্রবর্তন করেন, যা ইবনে হাইসাম পরবর্তী সময়ে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান।

$$(n+1)\sum_{i=1}^{n} i^k = \sum_{i=1}^{n} i^{k+1} + \sum_{p=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{p} i^k\right)$$

$$n = 4,\ k = 1,\ 2,\ 3$$

ইবনে হাইসামের অনুসরণে কলনবিদ্যার একটি মূলগত ধারণা

কলনবিদ্যা হচ্ছে গণিতের এমন একটি শাখা, যেখানে সীমা, অন্তরকলন, সমাকলন এবং অসীম শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কলনবিদ্যাকে মূলত দুটি শাখায় বিভক্ত করা হয়, যেমন: ১. অন্তরকলন (Differential Calculus) এবং ২. সমাকলন (Integral Calculus)। আজকের দিনে আমরা নিউটনকেই কলনবিদ্যার জনক হিসেবে আখ্যায়িত করি। গণিত সম্পর্কিত বিভিন্ন ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইবনে হাইসাম ও নিউটন ছাড়াও, আর্কিমিডিস, মাধব, ভাস্কারাচার্য এবং লাইবনিজ প্রমুখ গণিতজ্ঞগণ কলনবিদ্যায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। এ ছাড়াও আধুনিক যুগের কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, নিউটন ইবনে হাইসামের গাণিতিক কর্ম দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা নিউটনের সমাকলন হলো ইবনে হাইসামের বুনিয়াদি কলনবিদ্যার একটি আধুনিক সংস্করণ।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নিউটন এবং ওনার সমসাময়িক জার্মান গণিতজ্ঞ গটফ্রিড উইলহেলম লাইবনিজ (১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দ-১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় একই সময়েই আধুনিক কলনবিদ্যার পত্তন ঘটান। যার ফলে, ওনাদের মাঝে একধরনের তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকন্তু খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ স্টিফেন হকিং ওনার ***A Brief History of Time*** বইয়ে নিউটনকে ধুরন্ধর ও মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও নিউটন কলনবিদ্যা উদ্ভাবন করেছেন ইবনে হাইসামের মতোই, অনেকটা

জ্যামিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্যদিকে, লাইবনিজ কলনবিদ্যা উদ্ভাবন করেন অসীম অনুক্রমসমূহের যোগফল নিয়ে ঘাটঘাটি করতে করতে। বর্তমান সময়ে, কলনবিদ্যা আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিউটন এবং লইবনিজ উভয়কেই দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে লইবনিজের কলনবিদ্যার পদ্ধতি ছিল নিউটনের চেয়ে অনেক সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমাদের সমাজের কিছু ব্যক্তি প্রায়ই স্যার আইজ্যাক নিউটনকে বিজ্ঞানজগতের একজন মহাচোর বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। সত্যি বলতে, ওনার মতো একজন মহাবিজ্ঞানী সম্পর্কে এরূপ কটূক্তি নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক। কেননা একটি শক্তিশালী তত্ত্ব হঠাৎ করে কারো মাথা থেকে বের হয় না। বরং সেই তত্ত্বের পেছনে থাকে, শত শত বছর ধরে বেশ কিছু মানুষের পরিমার্জন। কোনো সন্দেহ নেই, নিউটনের অনেক আগেই বলবিদ্যা ও কলনবিদ্যা সম্পর্কিত চিন্তনের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু নিউটন এই সকল চিন্তনের পরিপূর্ণ রূপ দান করেছেন। বিজ্ঞান অবিসংবাদিতরূপে একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মনীষীদের বৈজ্ঞানিক কর্মসমূহ যাচাই-বাছাই করে, আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো শাখার সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় নিউটনের অবদানকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

কামালআদ্দিনের বর্ণিত আজব প্রাণীদের বাস্তব অস্তিত্ব থাকা আদৌ কি সম্ভব?

এই প্রবন্ধের শিরোনামে 'কামালআদ্দিন' বলে যে ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি আর কেউ নন, মিশরের খ্যাতনামা মুসলিম পণ্ডিত আল্লামা কামালআদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-দামিরী (১৩৪৪-১৪০৫)। তিনি ১৩৭১ খ্রিষ্টাব্দে ওনার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ ***হায়াতুল হায়াওয়ান আল কুবরা*** সম্পন্ন করেন। আমার চিন্তনে ***হায়াতুল হায়াওয়ান আল কুবরা*** বাংলায় অর্থ করলে দাঁড়াবে 'জীবজন্তুর সমৃদ্ধ জীবনকথা'। এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ছিল জীবজন্তুদের বিশ্বকোষ, যেখানো প্রায় ৯৩১টি জীবজন্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থটি প্রাণস্পর্শী বর্ণনাবিন্যাস, বিস্তর জ্ঞানাশীলন এবং তত্ত্ব ও তথ্যভাণ্ডারের একটি অপূর্ব সমুদ্র। অধিকন্তু এই গ্রন্থটিতে এমন কিছু প্রাণীর বর্ণনা আছে, যাদের অস্তিত্ব রূপকথার কাহিনিতেই সম্ভব, বাস্তবে নয়। তথাপি, এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওনার সেই রূপকথার অবাস্তব প্রাণীদের প্রত্যক্ষরূপে ও ঐতিহাসিকভাবে বাস্তব রূপ দেওয়া। কেননা, ***হায়াতুল হায়াওয়ান আল কুবরা*** গ্রন্থের ভূমিকায় মুখবন্ধে আল্লামা কামালআদ্দিন নিজেই বলেছেন:

'...এই কিতাবটি লেখার জন্য কোনো ব্যক্তি আমার কাছে আবেদন করেনি। এমনকি আমি নিজে থেকেও তৈরি করে ইহা লিখিনি। বরং শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের সময়, মূল ঘটনা আমার সামনে এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেগুলো লুকিয়ে রাখা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না, ঠিক যেমন নববধূর সুগন্ধকে ঢেকে রাখা সম্ভব হয় না...।'

প্রাচীন সভ্যতার মানুষদের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রমণীরা নাকি সমুদ্রচারী মায়াবী প্রাণী, যারা আসলে অর্ধেক নারী ও অর্ধেক মাছ। ইংরেজিতে এদের বলা হয় মারমেইড (Mermaid), যার বাংলা অর্থ মৎস্যকন্যা। আবার অনেকেই এদের বলে জলপরি। এই মৎস্যকন্যাদের নিয়ে রহস্যের শেষ নেই। প্রায় সব দেশের গল্প, উপকথা আর রূপকথায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে মৎস্যকন্যাদের কাহিনি। মৎস্যকন্যাদের নিয়ে সিনেমা, কাব্য, গল্প, রূপকথা কম হয়নি। নানা জন নানা রূপে উপস্থাপন করেছেন

মৎস্যকন্যাদের। প্রাচীন অ্যাসিরীয় সভ্যতায় মৎস্যকন্যা সম্পর্কে এ রকম গল্প শোনা যায়, দেবী এটারগেটিজ নাকি একবার ভুল করে হত্যা করে ফেলেন তার একজন মানুষ বন্ধুকে। আর তার পরই তিনি দুঃখে ও লজ্জায় দেবী থেকে পরিণত হন মৎস্যকন্যায়। এ ছাড়াও ওয়াল্ট ডিজনির বিখ্যাত সৃষ্টি লিটল মারমেইড এরিয়েল ও রাজকুমার এরিকের অসাধারণ গল্পের কথা কে না জানে। তাদের নিয়ে রয়েছে নানাবিধ ঐন্দ্রজালিক রহস্য। আবহমানকাল ধরে, এরা সমুদ্রে কাল্পনিকরূপে ছিল এবং এখনো আছে। সামুদ্রিক নানা অভিযাত্রায় রয়েছে এদের বিভিন্ন অস্তিত্বের প্রমাণ।

প্রাচীন গ্রিক রৌপ্যমুদ্রায় মৎস্যকন্যারূপে দেবী এটারগেটিজ

এই রহস্যময়ী অর্ধনারীর অবয়ব চিত্রের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রে। সেটা প্রায় ৩০ হাজার বছর আগের কথা। মানুষ সে সময় মাটিতে ফসল ফলাতে শিখেছে, সমুদ্রপথে ভাসানো শুরু করেছে জাহাজ। সুন্দরী মৎস্যকন্যারা মাঝ সমুদ্রে দারুণ মিষ্টি গলায় গান গায়, আর ওই গানের আকর্ষণে নাবিকরা দিক ভুল করে পৌঁছে যায় অন্যদিকে। তখন তারা নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে নাবিকদের মেরে ফেলে, আর না হয় তাদের ধরে নিয়ে যায় গভীর সমুদ্রের নিচে। হয়তো এটাই মৎস্যকন্যাদের সাথে মানুষদের শত্রুতার কারণ। কেননা দক্ষিণ আফ্রিকার কারু নামক অর্ধমরুভূমি অঞ্চলের গুহাচিত্রে দেখা গেছে, মৎস্যকন্যারা সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে আর মানুষ তাদের দিকে বর্শা ও তীর ছুড়ে মারছে।

গুহাচিত্রে মানুষরা বর্শা ও তীর ছুড়ে হত্যার চেষ্টা করছে মৎস্যকন্যাদের

মৎস্যকন্যা দেখেছেন এমন মানুষের মধ্যে সবার আগে চলে আসে ইতালির বিখ্যাত নাবিক কলম্বাসের নাম। ১৪৯৮ সালে, আমেরিকা আবিষ্কার করে পৃথিবীর ইতিহাসে আলাদা করে জায়গা করে নেওয়া কলম্বাসের নোটবুকেও রয়েছে মৎস্যকন্যার উল্লেখ। ওনার সেই নোটবুকের বর্ণনা অনুসারে, তিনি যখন ক্যারাবিয়ান দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নাকি এক অর্ধমানবী অর্ধমাছকে সমুদ্রবেলায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। এ বিষয়টিকে অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিলেও, বিশ্বাসীরা এটাকেই মেনেছেন মৎস্যকন্যাদের অস্তিত্বের সপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটা একদমই মনে করি না। কারণ আদিম গুহাচিত্র ছাড়াও, কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার অনেক পূর্বেই, ১৩৭১ খ্রিষ্টাব্দে সম্পন্ন করা আল্লামা কামালআদ্দিনের ***হায়াতুল হায়াওয়ান আল কুবরা*** গ্রন্থে মৎস্যকন্যা সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত আছে:

'...'বানাতুল মা' (সামুদ্রিক কন্যা) নামে রোম সাগরে একধরনের মাছ পাওয়া যায়। মাছগুলো নারীসদৃশ এবং যাদের চুল সোজা ও শরীর বাদামি রঙের। তাদের লজ্জাস্থান ও স্তনযুগল বড় হয়। এরা কথা বলতে পারে, কিন্তু এদের কথা বোঝা যায় না। তারা হাসতে পারে এবং মাঝেমাঝে অট্টহাসিও দেয়। কখনো কখনো নাবিকরা এদের ধরে সহবাস করে ছেড়ে দেয়। রুইহানি বলেন, 'যখন কোনো শিকারি ওনার নিকট নারীসদৃশ কোনো মৎস্য ধরে আনা হতো, তখন তিনি শিকারিদের নিকট শপথ নিতেন যে, এদের (মৎস্যকন্যাদের) সাথে কখনো সঙ্গম করবে না...।'

১৮৪৭ সালের কথা, ৮০ বছর বয়সী এক জেলে দাবি করেন, তিনি নাকি উপকূল থেকে ২০ গজ দূরে একটি মৎস্যকন্যা দেখেছিলেন। ওনার বর্ণনা অনুসারে, মৎস্যকন্যা তখন গলদা চিংড়ির দাঁত দিয়ে নিজের চুল আঁচড়াচ্ছিল। তবে খুব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা

যায়নি সেই মৎস্যকন্যার দিকে।

যখনই ওই মৎস্যকন্যা বুঝতে পারল কেউ তাকে দেখছে, অমনি সে টুপ করে পানিতে তলিয়ে যায়। অধিকন্তু, ২০০৯ সালে মৎস্যকন্যা দেখা যাওয়ার একটি ঘটনা ঘটেছে ইসরায়েলের 'কিরিয়াত ইয়াম' নামক শহরে। দুজন বন্ধু পাহাড়ের ওপর থেকে সমুদ্রতীরে পাথরের ওপরে মাছের মতো একটা প্রাণী বসে থাকতে দেখে। তারা ওই প্রাণীটির ভিডিও করতে শুরু করে। প্রাণীটি মানুষের অস্তিত্ব বুঝতে পেরে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। ওই ভিডিওটা তারা ফেসবুকে আপলোড করার পর রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায়।

'কিরিয়াত ইয়াম'-এ ভিডিওতে ধারণকৃত সেই মৎস্যকন্যা

২০১২ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে, ড্যানিশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম প্রথমবারের মতো একটি মৃত মৎস্যকন্যার কঙ্কাল সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করে। পরবর্তী সময়ে, সেই মৎস্যকন্যাটির বৈজ্ঞানিক নাম Hydronymphus Pesci বলে দাবি করা হয় এবং ধারণা করা হয় সেই মৎস্যকন্যাটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মারা গেছে। এই মৎস্যকন্যাটির কঙ্কালটি ডেনমার্কের হেরোল্ডস্কেয়ার নামক অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অঞ্চলের একজন কৃষক ভূমিকর্ষণের সময় সেই মূল্যবান কঙ্কালটি আবিষ্কার করেন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এই মৎস্যকন্যাটির বয়স ছিল ১৮ বছর এবং তার ছিল লম্বা

মোটা চুল ও তীক্ষ্ণ দন্ত। মৎস্যকন্যাটির মৃত্যুর পর, হয়তো কিছু মানুষ সমুদ্র থেকে পাওয়া সেই মৎস্যকন্যার মৃতদেহটি হেরোল্ডস্কেয়ারের একটি জমিতে দাফন করেছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন লোককাহিনিতে বর্ণিত পরমা সুন্দরী মৎস্যকন্যা এবং ড্যানিশ ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি মৎস্যকন্যার কঙ্কাল

এবার মৎস্যকন্যার পুংলিঙ্গ মৎসাপুরুষের ব্যাপারে আসা যাক। প্রাচীন মেসোপটামিয়ার বিখ্যাত দেবতা হলেন 'ডাগান', যিনি আসলে ছিলেন শ্মশ্রুধারী অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক মাছ। ওনাকে মূলত ফসল-উর্বরতার দেবতা হিসেবে উপাসনা আরম্ভ হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২৫০০ অব্দের দিকে। আল্লামা কামালআদ্দিন ওনার ***হায়াতুল হায়াওয়ান আল কুবরা*** গ্রন্থে মৎসাপুরুষকে 'ইনছানুল মা-ই' (সামুদ্রিক মানুষ) বলে সম্বোধন করেছেন। উনি বলেন, ওরা পানিতে বসবাসকারী মানুষ এবং স্থলের মানুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উনি আরো আমাদের জানান, রোম সাগরে কোনো কোনো সময় অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক মাছ ধরনের মানুষ দেখা যায়, যাদের সাদা দাড়িও হয়ে থাকে। হজরত লাইথ ইবনে সাদ (৭১৩-৭৯১) নামক একজন মিশরীয় পণ্ডিত বলেন, 'সামুদ্রিক মানুষ (মৎসাপুরুষ) কোনো অবস্থাতেই খাওয়া বৈধ নয়।'

ফ্রান্সের লুভ্যর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত প্রাচীন সুমরীয়দের খোদিত মৎসাপুরুষ 'ডাগান'

যাই হোক, আল্লামা কামালআদ্দিন ওনার ***হায়াতুল হায়াওয়ান আল কুবরা*** গ্রন্থে 'আবু মুযাইনাহ' শব্দ ব্যবহার করেন মনুষ্য আকৃতির সামুদ্রিক মাছ বোঝাতে। ওনার গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায়, এ ধরনের মাছ ইসকান্দরিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং যেগুলো দেখতে প্রায় মানুষের মতো। এদের চামড়া তৈল চিটচিটে হয়। এরা মানুষের মতো কাঁদতে পারে। সমুদ্র হতে বের হয়ে তীরের দিকে এলে, মানুষ তাদের ধরে ফেলে। তবে দয়া পরবশ হয়ে শিকারি মাঝে মাঝে ওদের ছেড়েও দেয়। এই বর্ণনার সূত্র ধরে এগোলে, প্রায় এ রকমই একটি প্রাণী ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীঘা সমুদ্র উপকূলে ধরা পড়েছিল। বিস্তারিত তথ্য পাওয়া না গেলেও, ছবিতে ও স্বল্প সময়ের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে এ রকম প্রাণী, যার মাথা ছিল সম্পূর্ণ মাছের মতো। অধিকন্তু এর গলা থেকে দেহের বাকি অর্ধেক ছিল হুবহু মানুষের মতো। তবে তার হাত দুটি পেছনে বাঁধা ছিল। ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রাণীটি তখনো জীবিত ছিল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, প্রাণীটি বন্দর কর্তৃপক্ষের হেফাজতে ছিল।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীঘা সমুদ্র উপকূলে পাওয়া মনুষ্য আকৃতির সামুদ্রিক মাছ

আমরা জানি, 'ভাসু বিহার' বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। স্থানীয়রা একে নরপতির ধাপ হিসেবেও অভিহিত করে। এই প্রত্নস্থলে খননের ফলে, পরবর্তী গুপ্তযুগের দুটি আয়তক্ষেত্রাকার বৌদ্ধবিহার এবং একটি প্রায় ক্রুশাকৃতি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায়, মহাস্থানগড় থেকে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে বিহার ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিহার নামক গ্রামে অবস্থিত। যাহোক, খননকার্যের ফলে এই 'ভাসু বিহার' থেকেই একটি উল্লেখযোগ্য ফলক-চিত্র আবিষ্কৃত হয়, যেটাতে একটি মৎস্যকুমারের প্রতিকৃতি স্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ ছিল।

'ভাসু বিহার' থেকে প্রাপ্ত ফলক-চিত্রে একটি মৎস্যকুমারের প্রতিকৃতি

(**সূত্র:** *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, পৃষ্ঠা-৪১৪, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি)

এবার এরেকটি অদ্ভুত প্রাণীর বিষয়ে আসা যাক। আল্লামা কামালআদ্দিনের লেখা ***হায়াতুল হায়াওয়ান আল কুবরা*** গ্রন্থে 'সাতিহ' নামের একজন ব্যক্তির কথা জানা যায়। সেই লোকটি ছিল আরবের প্রসিদ্ধ জাদুকর, যার মাতা ছিল একজন জ্যোতিষিনী। 'সাতিহ'র পিতার নাম আমর ইবনে আমের এবং জ্যোতিষিনীর মাতার নাম তরিফা। 'সাতিহ'র যখন জন্ম হয়, তখনই তার মা তরিফা ইন্তেকাল করে। মৃত্যুর পূর্বে, তরিফা তার নিজের সন্তান 'সাতিহ'কে প্রথম ও শেষবারের মতো দেখতে চায়। যখন 'সাতিহ'কে তরিফার সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন সে দেখে 'সাতিহ'র চেহারা তার বক্ষদেশে ছিল এবং তার গর্দান ও মাথা ছিল না। তখন তরিফা নিজের লালা সেই নবজাতক 'সাতিহ'র গলায় ঢেলে দেয়, এবং বলে: 'এই শিশু জ্যোতিষবিদ্যায় আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। ***হায়াতুল হায়াওয়ান*** গ্রন্থেও এই বর্ণনা অনুসারে এটা লক্ষণীয় যে, 'সাতিহ' একজন মাথাবিহীন মানুষ, যা বস্তবে সত্যিই অসম্ভব। আসুন দেখা যাক, ***হায়াতুল হায়াওয়ান***-এর বর্ণনা ছাড়াও অন্যান্য চিত্রণ ও বিবরণ থেকে পাওয়া সাক্ষ্য ও তথ্য কী বলে।

আমরা হয়ত অনেকেই প্রাচীন গ্রিক পরিব্রাজক ও পণ্ডিত মিগাস্থিনিয (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-২৯০ অব্দ)-এর নাম শুনে থাকব। যিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮ অব্দের পূর্বে কোনো এক সময়, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে প্রেরিত প্রয়াত সম্রাট আলেকজান্ডারের সেনাপতি ও ব্যাবিলনের রাজা সেলুকাস নিকেটরের দূত পর্যটক ও ভারততত্ত্ববিদ। মিগাস্থিনিয ভারতে বেশ কিছুকাল অবস্থান করে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা ও ভারতবর্ষের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ভৌগোলিক বিষয় সম্বন্ধে ***ইন্ডিকা*** নামক একটি গ্রন্থ লেখেন। এই মূল গ্রন্থ ***ইন্ডিকা*** হারিয়ে গেলেও এরিয়ান, স্ত্রাবো, ডাইয়াডোরাস প্রমুখ পরবর্তীকালের লেখকদের রচনায় যে বহুল উদ্ধৃতি ব্যবহার হয়েছিল, তার একটি সংগ্রহ জার্মান পণ্ডিত অধ্যাপক ই. এ. শোয়ানবেক ১৮৪৬ সালে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন।

সম্রাট আলেকজান্ডারের মম্মুখে মাথাবিহীন মানব (বামে), এবং আন্দ্রিয়া বিয়ানকোর আঁকা মানচিত্রে ভারতের মুখহীন মানব (ডানে)

মিগাস্থিনিযের ***ইন্ডিকা*** অনুসারে, ভারতের পূর্ব প্রান্তে গঙ্গার উৎপত্তিস্থলে একজাতীয় মানুষ বাস করে। তারা পানাহার করতে করে না, কারণ তাদের মুখই নেই। ওরা কেবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং নাসারন্ধ্র দ্বারা সুগন্ধ আঘ্রাণ করে জীবিত থাকে। এ কারণে, পুষ্প ও বন্য ফলের বিবিধ গন্ধ ছাড়া তাদের আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। জানা যায়, কিছু মুখবিহীন মানুষদের সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নিকট আনা হয়েছিল। অধিকন্তু ব্রিটিশ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত চতুর্দশ শতাব্দীর একটি ফরাসি সাহিত্যকর্ম ***Roman d'Alexandre en Prose*** (***আলেকজান্ডারের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনি***) থেকে জানা যায়, মহাবীর আলেকজান্ডার নিজেও মাথাবিহীন মানুষের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সারা বিশ্বকে দেখানোর জন্য তিনি ৩০ জন মাথাবিহীন মানবকে বন্দি করেছিলেন। এ ছাড়াও ১৪৩৬ সালে, ইতালীয় নাবিক আন্দ্রিয়া বিয়ানকো একটি ভেলামের ওপর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন, যেখানে নির্দেশিত হয়েছে ভারত ভূখণ্ডের সেই মুখহীন মানব।

১৯২৯ সাল, তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের ঐতিহ্যবাহী তোপকাপি প্রাসাদের গুদামঘর সাফাইয়ের কাজ চলছে। সেখান থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন জার্মান গবেষক গুস্তাভ ডিসমানের নিকট প্রেরণ করা হলো। তিনি বেশ সতর্কতার সাথে পাণ্ডুলিপিগুলো পর্যবেক্ষণ করলেন। বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করার পরে তিনি বেশ পুরোনো একটি মানচিত্র খুঁজে পেলেন। হরিণের চামড়ায় আঁকা এই মানচিত্রটির

প্রায় অর্ধেক অংশ কোনো কারণে ছিঁড়ে গেছে। আতশ কাচের নিচে সেটি মেলে ধরলেন তিনি। তার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগল মানচিত্রটি। সমসাময়িক অন্য মানচিত্রগুলো থেকে এটি কিছুটা আলাদা। নির্মাতার নামানুসারে এর নাম রাখা হয় 'পিরি রেইসের মানচিত্র'।

পিরি রেইসের মানচিত্রে নির্দেশিত মথাবিহীন মানুষ

পিরি রেইস (১৪৬৫/৭০-১৫৫৩)-এর আসল নাম আহমেদ মুহিদ্দিন পিরি। তিনি বিখ্যাত অটোমান সাম্রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্মকর্তা (অ্যাডমিরাল) ছিলেন। শখের বসে ভূগোল নিয়ে কাজ করার জন্যও ওনার খ্যাতি ছিল। তুরস্কের সেই বিস্ময়কর মানচিত্রের নিচে বেশ স্পষ্টাক্ষরে পিরি রেইসের স্বাক্ষরকৃত সিলমোহরের ছাপ পাওয়া যায়। পল কেহলে নামক একজন প্রাচ্যবিদ এ বিষয়টি প্রমাণ করেন। পিরি রেইসের ব্যক্তিগত নথিপত্র থেকে জানা যায়, তিনি এই মানচিত্র অঙ্কনে প্রায় ২০টি প্রাচীন মানচিত্র এবং ভৌগোলিক পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছিলেন। এর মাঝে প্রায় ১০টি আরবি মানচিত্র, চারটি ভারতীয় মানচিত্র এবং কয়েকটি পর্তুগিজ নাবিকদের মানচিত্র রয়েছে। এই তালিকায় মহাবীর আলেকজান্ডারের আমলের মানচিত্রের নামও পাওয়া যায়।

স্যার ওয়াল্টার র‍্যালির বর্ণনায় গিয়ানার 'এয়াইপানোমা'

পিরি রেইস ছাড়াও, আরেকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি হলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ, অনুসন্ধানকারী এবং কবি স্যার ওয়াল্টার র‍্যালি (১৫৫২/৫৪-১৬১৮)। আঠারো শতকের শেষভাগে এসে আরো একটি বড় সাফল্যের পালক যুক্ত হয় ওয়াল্টার র‍্যালির মুকুটে। তিনি স্বর্ণের খনিতে সমৃদ্ধ একটি শহর আবিষ্কার করেন, যা বর্তমানে গিয়ানার অবস্থিত। গিয়ানা থেকে ফিরেই তিনি ***দ্য ডিসকাভারি অব গিয়ানা*** বইটি প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি গিয়ানার মাথাবিহীন মানবদের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের ওখানে 'এয়াইপানোমা' বলা হয়। গোঁড়া সমালোচকদের মতে, র‍্যালির ***দ্য ডিসকাভারি অব গিয়ানা*** ওনার সবচেয়ে বাজে বইয়ের একটি। কারণ ওনারা মনে করেন, এ বইয়ের অভিজ্ঞতায় র‍্যালি যতটা না সাফল্য পেয়েছেন, তার চেয়ে ১০ গুণ বাড়িয়ে লিখেছেন এবং নিজের গিয়ানা অভিযানকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে মহিমান্বিত করেছেন।

উপরের সকল আলোচনার ওপর ভিত্তিতে এটা সহজেই অনুধাবন করা যায়, ***হায়াতুল হায়াওয়ান আল কুবরা*** গ্রন্থের ধরন ও প্রকৃতি আল্লামা কামালআদ্দিনের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফসল। তিনি এই গ্রন্থে নানাবিধ প্রাণী সম্পর্কে যে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, তা তিনি আরবি বর্ণনাক্রমে সাজিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই, ওনার বর্ণিত বিষয়বস্তুর ওপর আরো অনেক কিছু জানার ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

সুতরাং, আমার মতো যারা ওনার এই গ্রন্থটির বিষয়ে পরবর্তী সময়ে গবেষণা করতে চান, তাদের জন্যও সেই পথ পুরোপুরি খোলা আছে। এই কারণে, এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা বা না করার কোনো বাধ্যবাধকতা একেবারেই নেই। বরং এই গ্রন্থটিকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই অধ্যয়ন করা উচিত, যা আল্লামা কামালআদ্দিন ওনার গ্রন্থে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

গাজ্জালির দর্শন কী হেত্বাভাস নাকী সহিহ হাদিস?

হাদিস শব্দের অর্থ বাণী, বার্তা, বিষয় ইত্যাদি। হাদিস শুধু একটি আভিধানিক শব্দই নয়, বরং ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। বস্তুত ইসলামী পরিভাষায় হাদিস হলো প্রিয় রাসুল হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কথা, কাজের বিবরণ এবং সে সকল কাজের সমর্থন, যা অনুমোদনযোগ্য ও নির্ভরযুক্ত সূত্রে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে হেত্বাভাস হলো এমন যুক্তি, যা আপাতদৃষ্টিতে সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান হলেও, আসলে তা ভুল। প্রকৃতপক্ষে, আমার এই প্রবন্ধটিতে বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রেখেই ওনার ***কিমিয়ায়ে সায়াদাত*** (সৌভাগ্যের পরশমণি) নামক গ্রন্থে কিছু চমৎকার দর্শনরূপী হেত্বাভাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে অজ্ঞতাবশত হাদিস হিসেবে বয়ান করা হয়, যা খুবই দুঃখজনক।

মহান মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি (রহ.)

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ওনার ***কিমিয়ায়ে সায়াদাত*** গ্রন্থে আত্মদর্শন অংশে 'মানব প্রকৃতির

মধ্যস্থিত নানারকম স্বভাব' এবং 'মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' নামক দুটি রচনায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা গাধা সৃষ্টি করেছেন বোঝা বহনের জন্য; কিন্তু গাধার মতো ঘোড়াও বোঝা বহন করতে পারে। তা ছাড়া ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাকে পিঠে বহন করে এবং যোদ্ধার ইঙ্গিতানুসারে চলা ও দৌড়ানোর শক্তিও রাখে। অতএব ঘোড়ার যোগ্যতা গাধার চেয়ে অনেক বেশি। ঘোড়া যদি এই অতিরিক্ত যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে না পারে, তবে ঘোড়া ও গাধার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই সবকিছু বিবেচনা করে ইমাম গাজ্জালি মানব স্বভাবকে সামগ্রিকভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা:

১. ইতর প্রাণীর স্বভাব: মানুষ সৃষ্টির সেরা। তাই কিছু নির্বোধ মানুষ ধারণা করে যে, তাদের শুধু আহার, নিদ্রা এবং যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সকলেরই জানা আছে, উটের পানাহার শক্তি ও চড়ুই পাখির সহবাস শক্তি মানুষের চেয়ে বেশি। তাহলে মানুষ কী করে উট ও চড়ুই পাখির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে? কার্যত কিছু মানুষের এ ধরনের মনোভাব ইতর প্রাণীর স্বভাবকেই নির্দেশ করে।

২. হিংস্র জন্তুর স্বভাব: কুকুর নিজ পা, চর্ম, আকৃতি এবং গঠনের দোষে ঘৃণিত ও নিন্দিত নয়; বরং তারা স্বজাতির প্রতি হিংসা পোষণ করে এবং দেখামাত্র আক্রমণ করে। এই হীন স্বভাবের জন্য কুকুর জাতি ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। ঠিক একইভাবে শূকর আপন আকার ও গঠনের দোষে ঘৃণিত নয়; বরং সর্বদা অপবিত্র এবং কদর্য বস্তুর জন্য লোভ করে থাকে বলে তারা ঘৃণিত। বস্তুত কিছু মানুষের মাঝেও শূকরসুলভ লোভ প্রতীয়মান হয়ে থাকে। অধিকন্তু কিছু মানুষের ক্রোধ নামক প্রবৃত্তি আছে বলে তারা কুকুর, বাঘ এবং সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ন্যায় মারামারি, গালাগালি ও বিশৃঙ্খলার মতো কুকর্মে লিপ্ত থাকে।

৩. শয়তানের স্বভাব: কিছু মানুষের মধ্যে ছলনা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এবং অপরের সাথে বিবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে তারা শয়তানের ন্যায় কার্য সম্পাদন করে থাকে।

৪. ফেরেশতার স্বভাব: যে সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি আছে, তারা ফেরেশতার ন্যায় সৎকর্ম সম্পাদন করে থাকে।

ইমাম গাজ্জালির এই অসাধারণ দর্শনটি আমাদের দেশে কিছু মানুষের মাঝে হাদিস হিসেবে বিকশিত হলেও, এটা আদৌ হাদিস নয়। একদা রোমের খ্রিষ্টীয় উপাসনালয়

'সাত' সংখ্যাটিকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে অনেক বিষয়ের তালিকা তৈরি করে, যার মধ্যে 'সাতটি নরকদণ্ডার্হ পাপ' অন্যতম। কার্যত এই 'সাতটি নরকদণ্ডার্হ পাপ' প্রবর্তন করেন মহান পোপ গ্রেগরি (৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ-৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ)। এই পাপগুলো হচ্ছে অহংকার, আলস্য, অতিভোজন, লাম্পট্য, লালসা, ঈর্ষা এবং ক্রোধ। পরে ১৫৯০ সালে, বিখ্যাত কবি এডমান্ড স্পেনসারের ***রানি পরি*** (*The Faerie Queene*) নামক মহাকাব্য প্রকাশিত হয়, যেখানে স্পেনসার অহংকারের বড়ির বর্ণনা দিয়েছেন, যা কিছুটা হলেও ইমাম গাজ্জালির এই দর্শনটির সাথে পরোক্ষভাবে মিলে যায়। হতে পারে স্পেনসার কোনোভাবে ইমাম গাজ্জালির এই দর্শনটির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। তবে, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই।

বিখ্যাত ইংরেজ কবি এডমান্ড স্পেনসার

স্পেনসারের 'সাতটি নরকদণ্ডার্হ পাপ'	দর্শন ও সাহিত্যের আলোকে বিশ্লেষণ
বাড়ির মালিক রানি লুসিফেরা ব্যক্তিগতভাবে অহংকারের প্রতিনিধিত্ব করে।	স্পেনসারের লুসিফেরা হলো লুসিফারের স্ত্রী লিঙ্গ এবং এই লুসিফারই সেই ইবলিস শয়তান, যে মহান আল্লাহ্‌র সামনে অহংকার প্রদর্শন করেছিল।
আলস্য হলো লুসিফেরার একজন উপদেষ্টা, যে সর্বদা গাধার পিঠে চড়ে থাকে।	ইমাম গাজ্জালি ওনার দর্শনে কর্মক্ষমতার দিক থেকে ঘোড়াকে গাধার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতীয়মান করেছেন।
অতিভোজন হলো লুসিফেরার একজন উপদেষ্টা, যে সর্বদা শূকরের পিঠে চড়ে থাকে।	ইমাম গাজ্জালি ওনার দর্শনে বলেছেন, শূকর সবসময় অপবিত্র এবং কদর্য বস্তুর জন্য লোভ করে থাকে।
লাম্পট্য হলো লুসিফেরার একজন উপদেষ্টা, যে সর্বদা ছাগলের পিঠে চড়ে থাকে।	ইমাম গাজ্জালির দর্শনে চড়ুই পাখির সহবাস শক্তি মানুষের চেয়ে বেশি। কিন্তু স্পেনসার হয়তো বিবেচনা করে দেখেছিল, হয়তো একটি উড়ন্ত পাখির পিঠে লাম্পট্যকে চড়ানোর চেয়ে ছাগলের পিঠে চড়ানো বেশি সহজ।
লালসা হলো লুসিফেরার একজন উপদেষ্টা, যে সর্বদা উটের পিঠে চড়ে থাকে।	ইমাম গাজ্জালি উল্লেখ করেছেন, উটের পানাহার শক্তি মানুষের চেয়ে বেশি।
ঈর্ষা হলো লুসিফেরার একজন উপদেষ্টা, যে সর্বদা নেকড়ের পিঠে চড়ে থাকে।	দেহের আকৃতির দিক থেকে নেকড়ে দেখতে কিছুটা কুকুরের মতো। এ ছাড়াও ইমাম গাজ্জালির দর্শন থেকে জনা যায়, কুকুর স্বজাতির প্রতি হিংসা পোষণ করে এবং দেখা মাত্র আক্রমণ করে।
ক্রোধ হলো লুসিফেরার একজন উপদেষ্টা, যে সর্বদা সিংহের পিঠে চড়ে থাকে।	ইমাম গাজ্জালির দর্শন অনুসারে, কিছু মানুষের ক্রোধ নামক প্রবৃত্তি আছে বলে তারা কুকুর, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ন্যায় মারামারি, গালাগালি এবং বিশৃঙ্খলার মতো কুকর্মে লিপ্ত থাকে। সিংহ সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ায়, ক্রোধের আরোহণের জন্য স্পেনসার হয়তো সিংহকেই বেছে নিয়েছেন।

ইমাম গাজ্জালি ওনার ***কিমিয়ায়ে সায়াদাত*** নামক গ্রন্থে আত্মদর্শন অংশে 'মানবদেহ বিশ্বজগতের নমুনা' নামক রচনায় মানবশরীরকে বিশ্বজগতের একটি ছাঁচ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ওনার দর্শন অনুযায়ী, মানবশরীর ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও, এতে বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু বিদ্যমান। কেননা গোটা বিশ্বে যত প্রকার বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তা একটু অনুসন্ধান করলে এদের প্রত্যেকটি নমুনা পাওয়া যেতে পারে। শরীরের অস্থিখণ্ড

পর্বতসদৃশ। এ ছাড়াও, দেহের ঘাম বৃষ্টি, লোমগুলো উদ্ভিদ, মস্তিষ্ক আকাশ, এবং ইন্দ্রিয়গুলো তারকাতুল্য। মোটকথা, মানবশরীরে যাবতীয় বস্তুর নমুনা রয়েছে। এমনকি শূকর, কুকুর, সিংহ, বাঘ, জিন, পরি, ফেরেশতা ইত্যাদির নমুনাও মানবদেহে বিদ্যমান রয়েছে।

গাজ্জালির দর্শনে বিশ্বজগতের ছাঁচে মানবশরীর

ইমাম গাজ্জালির এই দর্শনটি সূত্রবিহীন হাদিস হিসেবে সর্বপ্রথম শুনেছিলাম একজন তরুণ ইমাম সাহেবের বয়ানে। যিনি ওনার দেহের অঙ্গে কিছু স্থান নির্দেশ করে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নদ-নদী পাহাড়-পর্বতের ইঙ্গিত দিচ্ছেলেন। ব্যাপারটি আমার কাছে বেশ হাস্যকর মনে হয়েছিল, যদিও ইমাম সাহেবের বয়ানটি ছিল নিঃসন্দেহে অসাধারণ। অধিকন্তু, তিনি একজন পুরুষ হিসেবে যখন ওনার শরীরে পাহাড়-পর্বতের নিদর্শন ইঙ্গিত করছিলেন, তখন তিনি কী করে ভুলে গেলেন যে কৃত্রিম লিঙ্গ রূপান্তর ছাড়াও, আল্লাহ্‌র এই সুন্দর পৃথিবীতে নারী এবং হিজড়া নামক আরো দুটি সৃষ্টি আছে? কার্যত শারীরিক গঠনের দিক থেকে পুরুষ, নারী এবং হিজড়া সবাই একে অপরের চেয়ে কিছুটা হলেও ভিন্ন। পুরুষের কিছু অঙ্গ নারীর মধ্যে নেই এবং নারীরও কিছু অঙ্গ পুরুষের মধ্যে নেই। তা ছাড়াও, একজন হিজড়ার দেহ পুরুষ ও নারী উভয়ের দেহবৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে সৃষ্ট। তাই সব দিক বিবেচনা করে ইমাম গাজ্জালির এ ধরনের চমৎকার দর্শনগুলো হাদিস হিসেবে বর্ণনা করা পরিত্যাগ করা উচিত। তথাপি, দর্শন যত সুন্দরই হোক না কেন, দর্শনকে দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করাই উত্তম।

এরপর ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ওনার ***কিমিয়ায়ে সায়াদাত*** নামক গ্রন্থে আত্মদর্শন অংশে 'মানবদেহ বিশ্বজগতের নমুনা' নামক রচনায় উল্লেখ করেছেন, মাতৃস্তনে লাল বর্ণের রক্ত সাদা রঙের দুধে পরিণত হয় এবং পুরুষের অণ্ডকোষে লাল বর্ণের রক্ত সাদা রঙের শুক্রে পরিণত হয়। কার্যত এই অদ্ভুত কথাটি ইমাম গাজ্জালির অন্যতম একটি দর্শন ছাড়া কিছু

নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, আমাদের দেশে কখনো কখনো হাদিস হিসেবে, অজ্ঞ কিছু মানুষের মুখে মুখে এটা প্রচারিত হয়ে থাকে। যখন আমি রাইফেলস পাবলিক কলেজে পড়তাম, তখন একদিন সৌভাগ্যবশত নিউ মার্কেটে মৌলভি ধরনের একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই চিকিৎসক হাদিস হিসেবে ইমাম গাজ্জালির দর্শনটির সূত্র ধরে আমাকে বলেন, মানুষের স্বপ্নদোষ হওয়া এবং স্বমেহন করা ঠিক নয়, কেননা এক ফোঁটা 'শুক্র' ক্ষরণ এবং এক ফোঁটা 'রক্ত' ক্ষরণ একই জিনিস।

মায়ের বুকের দুধ ও পুরুষের শুক্র যদি রক্ত থেকেই উৎপন্ন হয়, তাহলে কোনো মানুষের বিয়ের পর অথবা যারা ঘন ঘন স্বমেহন করে থাকে, তাদের যেকোনো সময় অতিরিক্ত রক্ত নামক শুক্র ক্ষরণের ফলে মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তা আদৌ হয় না। এ ছাড়া মায়ের বুকের দুধ যদি রক্ত থেকে উৎপন্ন হয় তবে গবাদি পশুর দুধও রক্ত থেকে উৎপন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি নিজে যতটা জানি, একটি স্বাভাবিক অস্ট্রেলিয়ান গাভি দৈনিক গড়ে ন্যূনতম হলেও ২০ লিটার দুধ দিতে সক্ষম। যদি একটি গাভির শরীর থেকে দুধরূপী রক্ত প্রথমবার দোয়ানোতেই ২০ লিটার ক্ষরণ করা হয়, তখন সেই গাভিটির পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অধিকন্তু পবিত্র কুরআনে সুরা নাহলের ৬৬ নম্বর আয়াতে গবাদি পশুর দুধ উৎপন্ন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ নিজেই বলেছেন:

'আর নিশ্চয়ই গবাদি পশুদের সম্পর্কে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদের পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত বহির্গত দুধ, যা পানকারীদের জন্য খাঁটি এবং সুস্বাদু।'

পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ্‌ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, রক্তের সাথে দুধ উৎপন্নের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। মায়ের বুকের দুধ উৎপন্ন সম্পর্কে শুরুতেই বলতে হয়, যখন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সঞ্চারিত হয়, তখন স্তন দুধ উৎপন্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত মায়ের বুকে দুধ আসে না। স্তন প্রচুর মেদকোষ ও গ্রন্থি দিয়ে তৈরি। গর্ভস্থ মায়ের দেহে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণের ফলে স্তনের দুগ্ধক্ষরা কোষ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এ রকম অনেকগুলো কোষ মিলে তৈরি করে লবিউল। লবিউলের ছোট ছোট নালিকা মিলে তৈরি হয় বড় নালিকা। বড় নালিকাগুলো এসে স্তনবৃত্তে মিলিত হয়। স্তনের লবিউল কোষে দুধ উৎপন্ন হয়। পিটুইটারি, হাইপোথ্যালামাস এবং থাইরয়েড গ্রন্থির সমন্বিত কার্যক্রম পুরো ব্যাপারটি তদারক

করে।

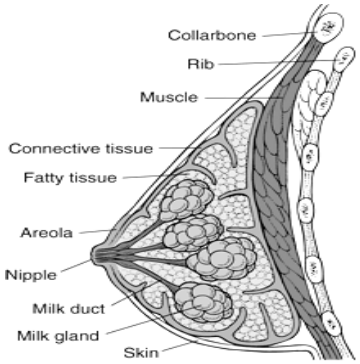

দুধ উৎপন্নে মাতৃস্তনের অভ্যন্তরীণ গঠন

এবার পুরুষের শুক্র উৎপন্নের ব্যাপারে আসা যাক। পুরষের মূত্রথলির নিম্নপ্রান্ত ও মলাশয়ের মাঝখানে অবস্থিত এক জোড়া ছোট আঙুলের মতো কোঁচকানো যে থলিকা রয়েছে, তাকে সেমিনাল ভেসিকল (Seminal Vesicle) বলে। প্রত্যেক থলিকা একেকটি প্যাঁচানো নালিকায় গঠিত এবং যোজক কলায় আবৃত। প্রকৃতপক্ষে, এই সেমিনাল ভেসিকল বিপুল পরিমাণ পিচ্ছিল থকথকে পদার্থ ক্ষরণ করে শুক্র উৎপন্ন করে থাকে।

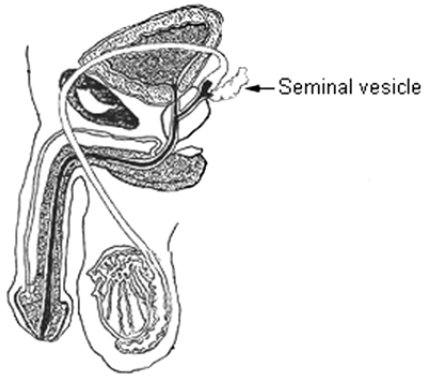

সেমিনাল ভেসিকলের দ্বারা পুরুষের শুক্র উৎপন্ন

মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কোনো একটি হাদিসকে সহিহ হিসেবে বিশ্বাস করার পূর্বে, প্রধানত তিনটি বিশেষ মূলনীতির ওপর নির্ভর করতে হয়। সহিহ হাদিসের সেই সকল মূলনীতি হল:

১. হাদিস পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট দলিলের বিপরীত হবে না।

২. হাদিস সুস্পষ্ট বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত হবে না।

৩. হাদিস এমন কোনো অর্থ প্রকাশ করবে না, যা বাস্তবতা বিরুদ্ধ ও হাস্যকর।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ইমাম গাজ্জালির ***কিমিয়ায়ে সায়াদাত*** নামক গ্রন্থে সংসার দর্শন অংশে 'ইহজগতের ছলনার কতিপয় দৃষ্টান্ত' নামক রচনায় প্রকৃত সূত্র ব্যতীত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়:

'ফেরেশতাগণ কেয়ামতের দিন ১দুনিয়াকে এক কুৎসিত বৃদ্ধার রূপে উপস্থিত করবেন। বার্ধক্যের কারণে এর চোখ দুটো সবুজ বর্ণে পরিণত হবে। বৃহৎ দাঁতগুলো মুখের বাইরে ঝুলে পড়বে। এই বিশ্রী আকৃতি দেখে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে। সকলে চিৎকার করে প্রশ্ন করবে: কে এই জঘন্য নারী? তখন ফেরেশতাগণ জবাবে বলবেন, ২এই নারী হলো সেই দুনিয়া যার জন্য মানুষ হিংসা ও শত্রুতার বর্শবর্তী হয়ে কলহ ও রক্তারক্তি করেছিল। আত্মীয়তার মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিল। সব মিলিয়ে, দুনিয়ার প্রতি মুগ্ধ ও অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর ৩দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষপ করা হবে...'

এই বয়ানটির ১ নম্বর আন্ডারলাইন বলছে, দুনিয়াকে কুৎসিত বৃদ্ধার রূপে উপস্থাপন করা হবে। এর অর্থ কী এই দাঁড়ায় যে দুনিয়াতে শুধু পাপী পুরুষ বাস করে, পাপী নারী নয়? তাই স্বভাবিকভাবেই প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়াকে কুৎসিত বৃদ্ধা ছাড়াও কুৎসিত বৃদ্ধের রূপেও উপস্থাপন করা হবে না কেন? এরপর দ্বিতীয় আন্ডারলাইন নারীরূপী দুনিয়ার স্বার্থে মানুষের হিংসা, রক্তরক্তি, কলহের কথা বলছে। তার মানে কী এই যে দুনিয়াতে একজন মানুষও কখনো মহৎ কাজ করেনি? যদি তাই হয়, মোহাম্মদ (সা.), ঈসা (আ.), মুসা (আ.), ইবরাহিম (আ.) প্রমুখ পয়গম্বররা কি মানুষ নামক প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়? এরপর

৩ নম্বর আন্ডারলাইন বলছে, দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে কথাটি খুবই হাস্যকর, কেননা মহান আল্লাহ্ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন শুধু মানুষ ও জিনজাতির জন্য, এ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। অধিকন্তু পবিত্র কুরআনে সুরা আরাফের ১৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন:

'আর আমি তৈরি করেছি জাহান্নামের জন্য এমন অনেক জিন ও মানুষ, যাদের হৃদয় আছে বটে কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না...'

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ওনার ***কিমিয়ায়ে সায়াদাত*** গ্রন্থে পরকাল দর্শন অংশে 'আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের ভুল দূরীকরণের দুটি যুক্তি' রচনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত পয়গম্বরদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। এখন এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে হলে, শুরুতেই ইতিহাসের সহায়তা নিতে হবে। আনুমানিক প্রায় ৮৭২ সালে, ইবরাহিম ইবনে হিশাম নামক একজন হাদিস বয়ানকারী মোট পয়গমম্বরদের সংখ্যার ব্যাপারে বর্ণনা করেন। বস্তুত তিনি এই হাদিসটি ওনার দাদা আবু জর গিফারীর মাধ্যমে বংশানুক্রমে পেয়েছেন বলে দাবি করেন। এ ছাড়াও তিনি ওনার দাদা আবু জর গিফারীকে মহানবী মোহাম্মদ (সা.)-এর একজন সাহাবি হিসেবেও দাবি করেন। হাদিসটি হল:

'আমি (আবুজর গিফারী) প্রশ্ন করলাম: হে আল্লাহ্র রাসুল! নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি [রাসুল (সা.)] বললেন, ১ লক্ষ ২৪ হাজার। আমি (আবু জর গিফারী) প্রশ্ন করলাম: হে আল্লাহ্র রাসুল! এদের মধ্যে রাসুল কতজন? তিনি [রাসুল (সা.)] বললেন, ৩১৩ জন, অনেক বড় সংখ্যা।'

অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ হাদিসটিকে জাল হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ইবরাহিম ইবনে হিশামকে একজন মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য করেন। কার্যত আবু হাতিম রাযী নামক একজন বিশেষজ্ঞ ইবরাহিমের কাছে হাদিস গ্রহণ করতে গমন করেন। তারপর তিনি সেখানে ইবরাহিমের পাণ্ডুলিপির সাথে মৌখিক বর্ণনার বৈপীরত্য ও অসামঞ্জস্য দেখতে পান। ফলস্বরূপ বিশেষজ্ঞ রাযী জাল হাদিস বয়ানকারী ইবরাহিমের সম্পর্কে বলেন, লোকটি কখনো হাদিস শিক্ষার পেছনে অধিক সময় ব্যয় করেনি এবং লোকটি মিথ্যাবাদী। যেহেতু, ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গমম্বর সম্পর্কিত হাদিসটি মিথ্যাবাদী

ইবরাহিম ইবনু হিশাম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেনি, তাই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ হাদিসটিকে জাল হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তা ছাড়াও, পবিত্র কুরআনে সুরা ফাতিরের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

'...এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যার নিকট আমি সতর্ককারী পাঠাইনি।'

এই আয়াতটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মহান আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গম্বরদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার নয়, বরং আরো বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন সবার আগে জানতে হবে, পৃথিবীতে কোনো সম্প্রদায় গঠিত হওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম মানবের আগমন কবে ঘটেছিল। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীগণ পবিত্র বাইবেল অনুসারে বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হজরত আদম (আ.)-এর আগমন ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ অব্দে। এখন এই বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই করা যাক। খ্রিস্টপূর্ব ৪২২১ অব্দে, মিশরে পঞ্জিকা তৈরি হয়েছিল। তথাপি খ্রিস্টপূর্ব ৪২৪১ অব্দে, মিশরে বৎসর গণনা শুরু হয়েছিল। মিশরে নেগাদা এবং এমিডোস অঞ্চলে কবর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল পাথরের হাতিয়ার, রুপা এবং তামা ব্যবহারের বিভিন্ন নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এগুলো খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের দিকে ব্যবহার হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ অব্দ নাগাদ, লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গেছে টেপপাওয়া নামক স্থানে। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০ অব্দে একদা যে লোকবসতি ছিল, তারই প্রমাণ মিলেছে সিরিয়ার উপকূলে বাসসামরাতে ৪০ ফুট ঢিবির নিচে। সব মিলিয়ে, পবিত্র বাইবেলের এই বিশ্বাসের সাথে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

বাংলাদেশ ও ভারতের সনাতন ধর্মের বিশ্বাসীরা মনে করেন, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষের নাম মনু যিনি পৃথিবীতে এসেছেন সেই 'সত্য' যুগে। কার্যত সনাতন শাস্ত্র অনুযায়ী 'সত্য', 'ত্রেতা' এবং 'দ্বাপর' যুগ অতিক্রম করে বর্তমানের মানবসমাজ 'কলি' যুগে অবস্থান করছে। এখন সনাতন শাস্ত্র অনুসারে বের করা যাক, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানবের আগমন কবে ঘটেছিল:

তিনটি যুগসমূহ	যুগগুলোর ব্যাপ্তিকাল
সত্য যুগ	১৭,২৮,০০০ বৎসর
ত্রেতা যুগ	১২,৯৬,০০০ বৎসর
দ্বাপর যুগ	৮,৬৪,০০০ বৎসর
সর্বমোট =	**৩৮,৮৮,০০০ বৎসর**

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কলি যুগ পড়ার ৩৮,৮৮,০০০ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মানবের আগমন ঘটেছিল। যদিও এই হিসাবটিও ঐতিহাসিকভাবে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাথে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আধুনিক বিজ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে, হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo Sapiens) নামক প্রজাতি হলো বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ। ১৮৬৮ সালে, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের একটি গুহায় ক্রোম্যাগনন নামক হোমো স্যাপিয়েন্সের একটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। সেই কঙ্কালটির বয়স ছিল প্রায় ৩০ হাজার বছর এবং সেটার সঙ্গে আধুনিক মানুষের কঙ্কালের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, বিবর্তনের পথ ধরে প্রকৃত মানুষের উন্মেষ ঘটে প্রায় ৫০ হাজার বছর পূর্বে। অধিকাংশ ইসলামিক বিশেষজ্ঞ বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন না। তাই বিবর্তনবাদের এই মতবাদটিকে বাদ দিয়ে, অনুমান করা যেতে পারে, হয়তো পৃথিবীর বুকে প্রথম মানবের আগমন ঘটেছিল প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে। বর্তমান সময়ের একজন মানুষ হিসেবে আমি নিজে এই প্রবন্ধটি লেখা অবস্থায় ২০২৪ সালে অবস্থান করছি এবং পৃথিবীর বুকে সর্বশেষ পয়গম্বর হিসেবে ৫৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানব হজরত আদম (আ.)-এর আগমনের পর থেকে মহানবী (সা.)-এর সময় পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে বিপুলসংখ্যক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছে, যা সত্যিই অগণিত।

আদিম কাল থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে অগণিত জাতি

তা ছাড়াও যদি বর্তমান বাংলাদেশের দিকেই লক্ষ করা হয়, সেখানে আমার মতো দেশীয় জনগণদের বাদ দিলে দেখা যাবে, চাকমা, মারমা, ব্যোম, গারো, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, মুরং, রাজবংশী, এভাবে প্রায় ৪৫টি সম্প্রদায় রয়েছে যাদের বাংলাদেশের উপজাতি বলা হয়ে থাকে। শুধু একটি কাল্পনিক যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যদি বলা হয়, ৫৭০ সালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু বাংলাদেশেই, এই ৪৫টি সম্প্রদায়ের নিকট পয়গম্বরদের আগমণ ঘটত, তাহলে ওনাদের সংখ্যা হিসাব করেও শেষ করা যেত না। তাই সব দিক বিবেচনা করে, পৃথিবীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের আগমন কোনোভাবেই যুক্তিসম্মত নয়। সুতরাং, পয়গম্বরদের সংখ্যা অগণিত হওয়া উচিত।

ক্রোম্যাগনন কঙ্কাল ও তার প্রকৃত রূপ

দর্শন হচ্ছে সাধারণ কথায় সামগ্রিক জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষণের মাধ্যমে, একজন চিন্তাশীল মানুষের মাঝে অভিজ্ঞতালব্ধ এক ধরনের বিশ্বাস, অথবা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা। কোনো সন্দেহ নেই, ইমাম গাজ্জালি (রহ.) দর্শনশাস্ত্রে একজন বিশিষ্ট সুপণ্ডিত ছিলেন। দর্শনকে তিনি মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ওনার মতে দর্শন মানুষকে শুদ্ধভাবে চিন্তা করতে এবং শৃঙ্খলার সাথে যুক্তি প্রয়োগ করতে শিক্ষা দেয়। চিন্তাধারার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের পক্ষে দর্শন একটি অকৃত্রিম সহায়। ওনার মতে দর্শনের স্থান ধর্মের নিচে। ধর্মঘটিত কোনো প্রশ্নের মীমাংসা করা দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। ওনার মতে যা চিরন্তন সত্য ও বাস্তব, সেখানে তিনি যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন না বরং সেক্ষেত্রে ভক্তিকেই প্রধান্য দিতেন। এখন আমাদের আধুনিক সমাজকেও বুঝতে হবে, ইমাম গাজ্জালির জীবনকাল ছিল ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাই ওনার সময়ের সেই সব পুরাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও দার্শনিক মতবাদের সাথে ২০২৪ সালের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও দার্শনিক মতবাদের তুলনা করা কোনোভাবেই যুক্তিসংগত নয়। তাই বর্তমান বাংলাদেশি মুসলমান সমাজেরও উচিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের গড়ে তোলা, যাতে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সকল ধরনের প্রতিকূল অবস্থাকে সঠিক ও ন্যায়ের সাথে মোকাবেলা করা যায়।